অনীক

জুন ২০১৩

বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ১২

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ

স্তন ক্যান্সার ও মানুষের জিন পেটেন্ট ❑ মিতা দত্ত ❑ ২

পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল নির্বাচন... ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ৪

খাদ্যশস্যের বদলে নগদ টাকা ❑ অনির্বাণ বিশ্বাস ❑ ৫

মুম্বাইয়ের স্কুলগুলো বিক্রি হতে চলেছে ❑ অরিজিৎ ❑ ৭

বস্তার জ্বলছে ❑ শ্যামল দাস ❑ ৮

চিটফান্ড কাণ্ড

চিটফান্ড কাণ্ডের স্বরূপ সন্ধান ❑ রূপম চ্যাটার্জী ❑ ১৪

চিটফান্ড : অনিয়ন্ত্রিত লুঠ ❑ সুদীপ্ত সাহা রায় ❑ ১৭

ওষুধ বিতর্ক

ওষুধের দাম, জেনেরিক নাম এবং... ❑ পূণ্যব্রত গুণ ❑ ২০

ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকান : এত বিতর্ক কেন? ❑ সিদ্ধার্থ গুপ্ত ❑ ২৫

প্রবন্ধ

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি... ❑ প্রদীপ রায় ❑ ২৯

আজকের পশ্চিমবঙ্গ : একটি পরিচয় ❑ পার্থসারথি ❑ ৩৪

অন্য চোখে

কে কার অলঙ্কার ❑ মালবিকা মিত্র ❑ ১১

কবিতা

সিন্দুর ❑ বিশ্বজিত সেন ❑ ১০

চাঁদ পোড়ে ❑ অজয় সেন ❑ ১০

বন্ধু সহযোদ্ধা কমরেড দীপংকর চক্রবর্তী ❑ জয়ন্ত বিশ্বাস ❑ ১০

স্মরণ : দীপংকর চক্রবর্তী

তুচ্ছ নও কেউ, তুমিও এসো কাছে ❑ দেবাশিস ভট্টাচার্য্য ❑ ৪০

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :

প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা

ই-মেল : aneek.bm@gmail.com

ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**

সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

ক্লেদাক্ত এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গড়ে তোল গণজাগরণ

উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতে, ৭ জুন দুর্বৃত্তরা কলেজ পড়ুয়া একটি মেয়েকে তার নিজের করে এলাকার মধ্যে গণধর্ষণ নৃশংস ভাবে খুন করলো। এই ঘটনার তিনদিন পরে নদীয়ার গেদে অঞ্চলে এক কিশোরীকেও দুর্বৃত্তরা একই ভাবে অমানুষিক নির্যাতনের পর হত্যা করে। নাগরিক সমাজের প্রতিবাদী তৎপরতা যেন একটু দেরিতে শুরু হলো মনে হচ্ছে। এর আগে ২০১১ সালে এই বারাসতেই নিজের দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে রাজীব দাস দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হওয়ার পর নাগরিক সমাজ যেভাবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল, সেই স্বতঃস্ফূর্ততা এখন অনেকটাই যেন ম্লান। খুন-জখম, নারী নির্যাতন-- এসব কী আমাদের গা-সওয়া হয়ে যাছে?

সম্প্রতি প্রকাশিত জাতীয় ক্রাইম রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ২০১২ সালে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনে শীর্ষস্থানে। পশ্চিমবঙ্গ যে এই প্রথম ভালো রেজাল্ট করলো তা তো নয়। গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ডে ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে। নারীকেন্দ্রিক অপরাধ সারা দেশেই বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃতিত্ব, অপরাধের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি রাখতে পেরেছে।

সমাজ-জীবনে বৈষম্য যত বেড়েছে, অপরাধের সংখ্যাও তত বেড়েছে। কিন্তু এখন সাধারণ মানুষ যে ব্যাপারে আতঙ্কিত, তা হলো অপরাধীদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। রাজনৈতিক প্রতিবাদী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য রাজশক্তির মস্তান-গুন্ডাদের ব্যবহার করার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছিল কংগ্রেসি আমলে। নকশাল দমনের নামে এরা শহরে-গ্রামে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। তারপর বামফ্রন্টের 'সুশাসনে' মাফিয়ারাজের আর এক মুখ দেখলো পশ্চিমবঙ্গ । লাশ-পাচারকারীরা হয়ে উঠলো 'দলীয় সম্পদ', কেউ বা ছিল 'মাস্টার' আর তাদের বাড়বাড়ন্ত হতে লাগল সাংসদ-বিধায়ক-মন্ত্রীদের ছত্রছায়ায়। বানতলায় অনিতা দেওয়ান-দের উপর নারকীয় অত্যাচার এবং মর্মন্তুদ মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন, 'এমন তো কতই হয়', তখন পশ্চিমবঙ্গ বুঝেছিল এ রাজ্যে অন্য এক শাসন শুরু হয়েছে, 'হাড় হিম করা' শাসনের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে র মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতায় নিয়ে এল। তারাও অচিরে বুঝিয়ে দিল, শাসকরা ভিন্ন সুরে কথা বলেনা, বরং অভিন্ন সেই শাসনই চলছে। মাফিয়া পরিবৃত, মাফিয়া পুষ্ট সরকার মাফিয়াদের দিল ঢালাও ক্ষমতা।

নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির মদতে সমগ্র দেশের অর্থনীতিটাই এখন মাফিয়াদের কবলে। লুম্পেন পুঁজিবাদ জন্ম দিয়েছে লুম্পেন সংস্কৃতির। লোক ঠকিয়ে-ঘুষ আদায়-তোলাবাজি করে, পেশিশক্তির পরাক্রম দেখিয়ে এবং আরো নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত বিপুল অর্থ উপায় করেছে। প্রোমোটারি, চিটফান্ড, জমির দালালি, ভেড়ি দখল ইত্যাদি নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের এই রাজ্যে উত্থান। এরই সঙ্গে বিকৃত নগরায়ন, শিল্পায়ন জন্ম দিয়েছে একদল উচ্ছৃঙ্খল শ্রেণীর মানুষের, বিত্তবানরা যাদের তাদের লুঠের লাঠিয়ালে পরিণত করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টিভি-সিনেমা-মিডিয়া প্রচারিত উদগ্র ভোগবাদী সংস্কৃতি। বিত্তবানদের চিত্ত বিনোদনের জন্য রাতারাতি গজিয়ে ওঠে হোটেল-রিসর্ট। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উচ্ছৃঙ্খল বিত্তহীনরা বেছে নেয় রাস্তার ধারে ঝুপড়ি বা পাঁচিলের আড়াল। শুধু ফাঁসির দাবি জানিয়ে এই অবস্থার প্রতিবিধান সম্ভব নয়। প্রয়োজন এই ক্লেদাক্ত সংস্কৃতি থেকে মুক্তি। দুর্বৃত্তদের রুখতে এলাকায় এলাকায় যেমন গণপ্রতিরোধ বাহিনী আজ গড়ে তোলা দরকার, তেমনই বিযাক্ত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য গণজাগরণের প্রয়োজন আজ বড়োই অনুভূত হচ্ছে।

স্তন ক্যান্সার, অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও মানুষের জিন পেটেন্ট

কদিন আগেই কাগজে জোর খবর, প্রখ্যাত হলিউড নায়িকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি তাঁর সম্ভাব্য স্তন ক্যান্সার নিরোধের জন্য নিজের স্তন দুটি সার্জারি করে বাদ দিয়েছেন (তার পর অবশ্য কসমেটিক সার্জারি করেছেন যাতে দৈহিক সৌন্দর্য অটুট থাকে) । শুধু তাই নয়, এ নিয়ে তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটি লেখাও লিখেছেন। প্রখ্যাত হলিউড নায়িকার এরকম কাজে সকলেই অবাক। এ যেন এক বীরত্বের কাজ। তাঁর সন্তানরা যাতে মাতৃহারা না হন (তিনি নিজের মাকে কম বয়সে হারিয়েছেন মায়ের স্তন ক্যান্সারের কারণে), তাঁর জন্য তাঁর এই কাজ, আর আরো সাহসের হলো সে কথা খোলাখুলিভাবে সবাইকে জানানো। তাঁর এই কাজ আরও অনেক নারীকে স্তন ক্যান্সার নিয়ে আরো সচেতন করবে, এ ধরনের কাজে প্রণোদিত করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রাথমিক গুঞ্জন মেলাতে না মেলাতেই কতগুলি প্রশ্ন এসে গেল। সত্যিই কি এরকম ক্ষেত্রে স্তন বাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত? নাকি, নিয়মিত নজরদারি এবং সত্যিই ক্যান্সার হলে সেই টিউমারের অংশটুকু বা প্রয়োজনে সেই স্তন বাদ দেওয়াই যথেষ্ট? প্রশ্ন উঠল BRCA-১ ও BRCA-২ জিনের মিউটেশন সংক্রান্ত নানা দিক নিয়ে, সে সংক্রান্ত পেটেন্ট ও কর্পোরেট মুনাফা নিয়ে।

ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। মানবদেহের হাজার বিশেক বংশগতি নির্ধারক জিনের মধ্যে কয়েকটি জিনে পরিবর্তন (মিউটেশন) ঘটলে তা স্তন ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। এই জিনগুলির মধ্যে প্রধান হলো BRCA-১ ও BRCA-২। এই পরিবর্তিত জিনটি বাবা-মার থেকে পুত্রকন্যাদের মধ্যে সংবাহিত হয়। অর্থাৎ যদি আপনার কোনো নিকট-আত্মীয়ের স্তন (বা ডিম্বাশয়ের) ক্যান্সার হয় এবং যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তাঁর শরীরে BRCA-১ বা BRCA-২ জিনটি পরিবর্তিত জিন, সেক্ষেত্রে আপনার শরীরেও এই জিনটি থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট। থাকলে, স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা ৫০-৮০ শতাংশ, ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের সম্ভাবনা ২০-৫০ শতাংশ। অ্যাঞ্জেলিনা জোলির মায়ের এই ধরনের স্তন ক্যান্সার হয়েছিল। অ্যাঞ্জেলিনা পরীক্ষা করিয়ে দেখেছেন যে তাঁর শরীরেও BRCA-১ জিনটি পরিবর্তিত, অর্থাৎ তাঁর স্তন (ও ডিম্বাশয়) ক্যান্সারের সম্ভাবনা খুবই বেশি। স্তন ক্যান্সার নিরোধে তিনি সার্জারির সাহায্যে স্তন দুটি বাদ দিয়ে নিয়েছেন (যদিও ডিম্বাশয় বাদ দিয়েছেন বলে কোনো খবর নেই)।

তবে স্তন ক্যান্সার শুধু জিনের কারসাজিতেই হয় না। প্রকৃতপক্ষে ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই স্তন ক্যান্সারের কারণ পরিবেশ ও জীবনযাপন সংক্রান্ত। তাই স্তন ক্যান্সার নিরোধ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জিনের ওপর একপেশে জোর পড়লে বাকি ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে স্তন ক্যান্সার নিরোধের বিষয়টি অন্ধকারে থেকে যায়। অ্যাঞ্জেলিনা জোলির মতো সেলিব্রিটির আলোয় ঢাকা পড়ে যায় অন্য ৯৫ শতাংশ কারণগুলি।

সেই কারণগুলি কী কী?

সন্তান না হওয়া, ধূমপান, পরিশ্রমের অভাব, খাদ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রাচুর্য, মদ, অতিরিক্ত মেদ, খাদ্যে আয়োডিনের অভাব, বিকিরণ, বিভিন্ন রাসায়নিক (নানা শিল্পে ব্যবহৃত পলিক্লোরিনেট বাইফিনাইল, ন্যাপথালিন জাতীয় বিভিন্ন পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, নানান অর্গানিক দ্রাবক ও কিছু কিছু কীটনাশক) ইত্যাদি। এমনকি স্তন ক্যান্সার শনাক্ত করার কাজে ব্যবহার হয় ম্যামোগ্রাফি নামের যে পরীক্ষাটি সেটি নিয়মিত করলেও স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে। দেখা গেছে, মহিলাদের ৪০ থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত যদি প্রতি বছর ম্যামোগ্রাফি করানো হয় তার থেকে প্রতি লক্ষে ২২ জনের স্তন ক্যান্সার হবে।

কারণগুলো থেকে মনে হয়, উন্নত বিশ্বে স্তন ক্যান্সার হবে অনুন্নত বিশ্বের চেয়ে বেশি, শহরে গ্রামের চেয়ে বেশি, আর জীবনযাত্রার পরিবর্তন, নগরায়ন ও দূষণবৃদ্ধির ফলে এই ক্যান্সার দিন দিন বাড়বে। তথ্যও তাই বলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় যেখানে প্রতি এক লক্ষ নারীর মধ্যে স্তন ক্যান্সার হয় ৯০ জনের, পশ্চিম ইউরোপে ৭৮ জনের, সেখানে পূর্ব এশিয়ায় হয় প্রতি লক্ষে ১৮ জনের। দক্ষিণ-মধ্য এশিয়ায় ২২ জনের, ভারতে ২৮ জনের। দেখা গেছে ভারতের শহরাঞ্চলে এই রোগটির হার গ্রামাঞ্চলের প্রায় তিন গুণ।

স্তন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যখন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি মডেল হয়ে ওঠেন, তখন এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ৯৫ শতাংশই চাপা পড়ে যায়। চাপা পড়ে যায় ভোগবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, কেএফসি বা ম্যাগডোনাল্ডের বিরুদ্ধে লড়াই, ধূমপান, মদ্যপান বিরোধিতা, চাপা পড়ে যায় দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই।

বদলে আমরা পাই স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত বা আক্রমণের মুখোমুখি ৫ শতাংশ নারীর কথা, কর্পোরেটের মুনাফার কথা, মানবশরীরের উপর পেটেন্টের কথা।

নতুন কোনো উদ্ভাবনের ওপর পেটেন্ট দেওয়া হয়, উদ্ভাবক যাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা বিক্রির একচেটিয়া অধিকার পেয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে। কোম্পানিগুলি গবেষণা

Unfiled Notes Page 2

খাতে যে পুঁজি বিনিয়োগ করে সেই ব্যয় পুষিয়ে যাতে মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়। বলা হয়, পেটেন্ট না দিলে কোম্পানিগুলির গবেষণায় কোনো উৎসাহ থাকবে না, তাই নতুন উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্টের প্রয়োজন। এখানে বলা ভালো, বিজ্ঞানের নতুন নতুন সূত্র আবিষ্কারের কোনো পেটেন্ট হয় না। তাই নিউটন তাঁর গতিসূত্রের জন্য বা আইনস্টাইন রিলেটিভিটি আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট পান নি। (ভাগ্যিস পাননি। পেটেন্টের মাধ্যমে তাঁরা এইসব আবিষ্কার নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখে দিতে পারলে বিজ্ঞান যে কতখানি পিছিয়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই।) পেটেন্ট হয়না প্রাকৃতিক বস্তুর উপরও। কিন্তু মুনাফাসন্ধানীরা এখন এই হয়না-র ফাঁকফোঁকর গলে নানা প্রাকৃতিক বস্তুর ওপরও পেটেন্ট নিয়ে নিচ্ছেন। এভাবেই পেটেন্টের আওতায় এসে গেছে মানবশরীরের কয়েক হাজার জিন।

মজার ব্যাপার, এই জিনগুলি 'আবিষ্কারের' পেছনে আছে বিভিন্ন দেশের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্রগুলির গবেষণা-জাত নানান জ্ঞান ও পদ্ধতি। কিন্তু বোধগম্য কারণেই পেটেন্ট পেয়ে যায় মুনাফালোভী কোনো কোম্পানি। কখনও হয়ত মোটা টাকার লোভে সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞানীও সেই কোম্পানিতে যোগ দেন, পার্টনার হন, বা নিজেই কোনো কোম্পানি খুলে বসেন।

সে কথা যাক। BRCA-১ ও BRCA-২, এই জিনদুটিও পেটেন্ট করা। পেটেন্টের মালিক মার্কিন দেশের *মিরিয়াড জেনেটিক্স*। তাদের দাবি, শরীর থেকে আলাদা করে এদুটিকে বের করেছে তাদের গবেষণা। তাই তারা এর একচেটিয়া অধিকারী। এর ফলে এই জিনটি শরীরে আছে কিনা সেই পরীক্ষার একচেটিয়া দাম নির্ধারণের অধিকারীও তাঁরাই। দামটি কম নয়। জনপ্রতি ৩০০০-৪০০০ মার্কিন ডলার (টাকার অংকে দেড় লক্ষ থেকে দু লক্ষ টাকা)। এদেশেও এই পরীক্ষা হয়। খরচ ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলির খবরের পর স্বাভাবিকভাবেই এই পরীক্ষার চাহিদা বেড়ে যাবে। তাতে ভবিষ্যত স্তন ক্যান্সার রোগীদের ৫ শতাংশ রোগটির সম্ভাবনা আগে থেকেই জানতে পারবেন। এতে তাঁদের কিছু সুবিধা হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু হু হু করে মুনাফা বাড়বে *মিরিয়াড* কোম্পানির। দুর্জনে বলছে, আজকের দিনে যখন বিভিন্ন কোম্পানির পণ্য বিজ্ঞাপিত করা, স্পনসর করাই সেলিব্রিটিদের প্রায় প্রধান কাজ, সেখানে অ্যাঞ্জেলিনা জোলির ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তটিকে খবরে পরিণত করাটা এমনি এমনি ঘটে নি। এখানে উল্লেখ্য, খবরটি প্রকাশিত হবার পর *মিরিয়াড* কোম্পানির শেয়ারের মূল্য একদিনে ৩ শতাংশ বেড়ে যায়। আরো উল্লেখ্য, মার্কিন সরকার আগে এই পরীক্ষাটির করার জন্য পয়সা দিত না। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তারা জানিয়েছে, কোনো ডাক্তারের নির্দেশে এ পরীক্ষাটি করলে তারা এর ব্যয়ভার বহন করবে।

শুধু *মিরিয়াড* কোম্পানি কেন, চিকিৎসা-বণিকরাও এতে উল্লসিত হবেন। কারণ BRCA-১ বা BRCA-২ জিন শরীরে পাওয়া গেলেও ডাক্তাররা সাধারণত আগে থেকেই স্তন বা ডিম্বাশয় বাদ দিতে বলেন না। নজরদারি, ও দরকারে সার্জারির কথা বলেন। এখন অ্যাঞ্জেলিনা জোলির উদাহরণে অনেক বেশি সংখ্যক BRCA-১ বা BRCA-২ পজিটিভ নারী স্তন বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন, আর ধনী ও উচ্চবিত্তরা অনেকেই এর সাথে যোগ করবেন সৌন্দর্য অটুট রাখার জন্য অতি-দামী কসমেটিক সার্জারিও। বলাই বাহুল্য, তাতে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন, অন্যত্রও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের প্রভূত লাভ।

আবার ফিরে আসি BRCA-১ বা BRCA-২ জিনের পেটেন্টধারী মিরিয়াড কোম্পানির কথায়। এই দুই জিনের পেটেন্ট নিয়ে আমেরিকার এই কোম্পানিটির বিরুদ্ধে মামলা চলছে। বাদী আমেরিকার অ্যাসোসিয়েশন অফ মলিকুলার প্যাথোলজি— তাদের পাশে আছে আমেরিকান সিভিল রাইট্স ইউনিয়ন। তাদের বক্তব্য, প্রথমত জিনদুটি মানবশরীরে প্রাকৃতিকভাবে বর্তমান জিন। তাই এদের পেটেন্ট বেআইনি। তাছাড়া, এই পেটেন্টের ফলে এই সংক্রান্ত গবেষণা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, ফলে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। অথচ, যেসব প্রযুক্তি দিয়ে *মিরিয়াড* কোম্পানি জিন দুটিকে পৃথক করেছে, সে প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছিল সরকারি ব্যয়ে, বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রে। জুন মাসেই এই মামলার ফল বেরোনোর কথা। দুর্জনে বলছে, মিরিয়াড কোম্পানি তাই অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকে সামনে রেখে একটা প্রচার আন্দোলনে নেমেছে।

শেষ কথা

আনন্দের কথা, ১৩ জুন (২০১৩) এই মামলার রায় বেরিয়েছে। তাতে বিচারপতিরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই দুটি জিনের ওপর *মিরিয়াড* কোম্পানির পেটেন্ট খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, *মিরিয়াড* কোম্পানি তো কোনো নতুন কিছু উদ্ভাবন করেনি, শুধু চারপাশের জেনেটিক বস্তু থেকে জিন দুটিকে পৃথক করেছে মাত্র। এটাকে আবিষ্কার বলা যায় না। তবে, কেউ যদি এইরকম কোনো জিনকে পরিবর্তিত করে নতুন জিন তৈরি করে তার পেটেন্ট নেওয়া চলবে।

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার আইনের নতুন নতুন ভাষ্য বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন তৈরি করে। অন্য সব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতো পেটেন্ট আইনও তাই একদিকে কোম্পানির মুনাফা আর অন্যদিকে মানুষের স্বার্থ নিয়ে লড়াইয়ের জায়গা। মার্কিন দেশের এই নতুন রায় তাই একটা আশার আলো দেখায়। ভবিষ্যতে এ নিয়ে টানাপোড়েন চলতেই থাকবে, সেটা বলাই যায়।

মিতা দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল নির্বাচনে অনাচার

আমাদের দেশে চিকিৎসাব্যবস্থায় অনাচার, গাফিলতির কারণে মৃত্যু বা ক্ষতি, রোগীর যথাযথ চিকিৎসা বা পরিষেবা না পাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগের বিচারের ভার ভারতের সংবিধান মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বা এমসিআই-এর হাতে ন্যস্ত করেছে। তেমনি রাজ্যে রাজ্যে সেই একই ধরনের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য রয়েছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। সাদা চোখে ব্যবস্থাটি রোগীর স্বার্থরক্ষাকারী বলে মনে হলেও কী রাজ্য, কী কেন্দ্রীয় স্তরে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে এই কাউন্সিল হয়ে উঠেছে স্বজন-পোষণ, ঘুষ, দুর্নীতির আখড়া।

প্রথমে শুরু করি কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর কথা দিয়ে। দেশের আইন মতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর স্বাধীন ও মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে এমসিআই-এর প্রতিনিধি দিয়ে কাউন্সিল চালানোর কথা। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যারা দিল্লীর দুর্গে আসীন থাকে, তারা চুপিচুপি তাদের পেটোয়া পার্টি সদস্য বা তাদের আত্মীয়-কুটুম্বদের মনোনয়নপত্র দিয়ে 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা'য় বিজয়ী ঘোষণা করে সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে আসছে। সর্বশেষ যে 'নির্বাচিত' কাউন্সিল ছিলো তার চেয়ারম্যান-এর নাম ডঃ চেতন দেশাই। স্মৃতিশক্তির ওপর মৃদু চাপ দিলেই মনে করতে পারবেন যে এই কেতন দেশাই ২০১০ সালে একটি ঘুষ কাণ্ডে জড়িয়ে হাজতবাস করেন। পরে অবশ্য দিল্লীর রাজনৈতিক মুরুব্বিদের ধরে জামিন আদায় করে নেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগ ছিলো যে তিনি বিপুল টাকা নজরানা নিয়ে সারা দেশের নানা স্থানে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিকে চালাও ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তারের পর কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল ভেঙে দিয়ে সরকারের পেটোয়া বেশ কিছু আমলা-ডাক্তারদের মনোনীত করে একটি 'অ্যাডহক কমিটি' মারফত মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর কাজ চালানোর ব্যবস্থা করে সরকার। অ্যাডহক কমিটিতে যেসমস্ত 'চিকিৎসক'দের মনোনীত করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, তাঁদের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে চিকিৎসার অবহেলা, অবৈধ চিকিৎসা, ওষুধ সংস্থার সঙ্গে অশুভ যোগাযোগ ইত্যাদি অনেক অভিযোগ কাউন্সিল-এ জমা পড়ে। দু-একটি মামলা শুনানির জন্য বিবেচিত হওয়ার পর পরই কাউন্সিল ভেঙে যায়!

আগেই বলেছি, দেশের নিয়মমতে প্রতি ৫ বছর অন্তর মুক্ত এবং স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত চিকিৎসকদের দ্বারা এই কাউন্সিল পরিচালিত হওয়ার কথা। কেননা এই কাউন্সিলই ঠিক করে চিকিৎসা সংক্রান্ত পঠন-পাঠন কেমন হবে, কী কী পরিকাঠামো থাকলে একটি হাসপাতাকে পাঠদানের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি তারা এটাও দেখে যে চিকিৎসায় অনাচার হয়েছে কিনা, ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসা বিষয়ক কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কিনা ইত্যাদি। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় তিন বছর এই কাউন্সিলে নির্বাচন হয়নি এবং চিকিৎসা গাফিলতির ভুরি ভুরি অভিযোগ প্রতিদিন জমা হলেও কাউন্সিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে।

এ হেন কেন্দ্রীয় সংস্থার রাজ্যস্তরের সংস্থাগুলির হাল আরও খারাপ। আমরা এখন বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কাউন্সিল নিয়ে দু-চার কথা বলবো। বাম আমলে অধিকাংশ চিকিৎসক জানতেন না যে পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল-এ নির্বাচন বলে একটি বস্তু বিদ্যমান এবং প্রতিটি রেজিস্টার্ড চিকিৎসক এই কাউন্সিল-এর সদস্যদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে একজন আইনসম্মত ভোটার। নানা বামপন্থী দল তাঁদের দলের ঘনিষ্ঠ চিকিৎসকদের (যাঁরা আবার সরকারি দাক্ষিণ্যে নানান সুবিধে পেয়ে থাকেন, সরকারি চাকরিতে বছরের পর বছর বদলি না হয়ে শহরে রয়েছেন, বহুক্ষেত্রে বেআইনিভাবে 'প্রাইভেট প্র্যাকটিস' চালান) 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত' করে আনতেন। গত তিনটি দশক এমনই চলে এসেছে। চিকিৎসার গাফিলতির বিষয়টিকে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল বিশেষ আমল দেয়নি। লাল ফিতের ফাঁসে আটকে অভিযোগকারীকে হেনস্থা করা থেকে শুরু করে অসহযোগের চূড়ান্ত পরিচয় রেখেছেন।

রাজ্যে পালা বদলের পর বাম আমলে 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত' কাউন্সিল-এর সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করে বসেন। সব বিষয়ে বাম সরকারের জনবিরোধী কাজের অন্ধ অনুসরণকারী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাবতীয় আইনি এবং সাংবিধানিক দায় অস্বীকার করে একটি বিতর্কিত এবং অসাংবিধানিক অর্ডিন্যান্স জারি করে কেন্দ্রীয় মেডিকেল কাউন্সিল-এর আদলে একটি 'অ্যাডহক কমিটি' গঠন করে। সেই কমিটিতে স্থান পান যথারীতি চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে অভিযুক্ত একাধিক চিকিৎসক সহ দুজন চিকিৎসক-বিধায়ক, যাঁরা সরাসরি তৃণমূলের টিকিট-এ নির্বাচিত হয়েছেন।

সৎ, দলবাজির রাজনীতির বিরোধী, বিবেকবান কিছু চিকিৎসক এই অনাচারের বিরুদ্ধে সরব হন। চিকিৎসায় গাফিলতির মামলা করে বিজয়ী ডাঃ কুণাল সাহা দেশের আইন দেখিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে আদালতে সরকারি অর্ডিনান্সটির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, অডিনান্সটি সম্পূর্ণতই অসাংবিধানিক, নির্বাচনের মাধ্যমে যথাযথ প্রতিনিধির পরিবর্তে মনোনয়ন করা প্রতিনিধি দিয়ে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল চালানো বেআইনি। জুলাই ২০১৩-র মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা কাউন্সিল গঠন ও পরিচালনের জন্য আদালত সরকারকে নির্দেশ দেয়।

এই নির্দেশের পর যাবতীয় কু-রঙ্গ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার একজন সরকারি কর্মচারী, এবং তিনি প্রায় প্রকাশ্যেই বিধায়কদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করছেন। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল ও চিকিৎসক-শিক্ষকদের মধ্য থেকে ৭ জন এবং অন্যান্য চিকিৎসদের মধ্য থেকে ৯ জনকে আইনত নির্বাচিত করার কথা। কিন্তু মনোনয়ন পত্র দাখিল করার জন্য যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো তাতে দেখা গেলো যে অন্যান্য চিকিৎসক কেন্দ্রের জন্য ৯টির পরিবর্তে ৭টি মনোনয়নপত্র দাখিলের সুযোগ থাকছে।

রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল-এর ইতিহাসে এই প্রথম রাজনৈতিক ছত্রছায়ার বাইরে চারজন চিকিৎসক এই অন্যান্য চিকিৎসক কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন। এঁদের অনেকের পরিবারের কেউ না কেউ চিকিৎসা-গাফিলতির শিকার। তাঁরা যখন এই বিষয়টি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন, তখন রিটার্নিং অফিসার তাঁদের লিখিতভাবে জানান যে দুটি পদ এলএমএফ-দের জন্য ফাঁকা রাখা আছে। হাস্যকর বিষয় হলো, আমাদের রাজ্য তথা দেশ থেকে এই লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক তৈরির পঠনপাঠন আনুমানিক ৮০ বছর আগে উঠে গেছে, ফলে ঐ লাইসেন্স-প্রাপ্ত চিকিৎসক পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই!

মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর ধরা পড়ে, এমন অনেক চিকিৎসক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, যাঁদের নিজেদের বিরুদ্ধেই চিকিৎসা-গাফিলতির মামলা রয়েছে। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেলো, সেই তালিকায় এমন একজন চিকিৎসকের নাম রয়েছে, যিনি আদতে সময়মতো মনোনয়নপত্র দাখিলই করেন নি। এই নিয়ে আদালতে মামলা করলেও তা শুনানির জন্য ওঠেনি।

সবচেয়ে আপত্তিকর ঘটনাটি দেখা গেলো নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে। ব্যালট পেপার-এ একটি ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া থাকছে যেটি ব্যালট জমা দেওয়ার খামেও মুদ্রিত থাকছে। নির্বাচকমণ্ডলী ভোটের পর সেই বন্ধ করা খাম খুলে, গোপন ব্যালট বের করে ব্যালটে মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা এবং খামের ওপর মুদ্রিত ক্রমিক সংখ্যা মিলিয়ে বৈধ ভোট হিসেব করা হবে। এর ফলে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষিত হবে না, যা মুক্ত স্বাধীন নির্বাচনের পরিপন্থী। বারবার এই বিষয়ে বিক্ষোভ দেখানো হলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে (পড়ুন, সরকারের তরফ থেকে) কেবল নেতিবাচক কিছু প্রতিশ্রুতি মিলেছে!

অনাচারের এখানেই শেষ নয়। চিকিৎসক-শিক্ষক কেন্দ্রে যাঁরা ভোটদাতা, তাঁরা আবার অন্য কেন্দ্রেরও ভোটার। অতএব তাঁদের নামে দুটি করে ব্যালট পেপার পাঠানো হচ্ছে, যার ক্রমিক সংখ্যা আলাদা। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে একসঙ্গে এই সমস্ত ব্যালট পেপার ডাক বিভাগ থেকে ডাঁই করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত ব্যালট পেপারের যে কী হাল হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। দু-একটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রকাশ্যেই শাসকদলের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করছেন এবং যাবতীয় ব্যালট পেপার নিজের কাছে রেখে দিচ্ছেন। দু-একটি মেডিকেল কলেজে শাসক দলের প্রার্থীদের 'দেহরক্ষী'রা অধ্যক্ষের ঘরে হানা দিয়ে ব্যালট পেপার ছিনতাই করে চম্পট দিয়েছে। স্বয়ং স্বাস্থ্য-অধিকর্তা একটি মেডিকেল কলেজে গিয়ে তাঁর সরকারি পদের অপব্যবহার করে শাসক দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেছেন।

এই অরাজক অবস্থার মধ্যে রাজ্য কাউন্সিলের ভোটপর্ব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যেখানে মুক্ত ও স্বাধীন নির্বাচন প্রক্রিয়া গোড়াতেই বড় ধাক্কা খেয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যহত হয়েছে— ব্যাহত হচ্ছে প্রতিদিন। এই পরিস্থিতিতে যে চারজন চিকিৎসক রাজনৈতিক মুরুব্বিদের ছত্রছায়ার বাইরে প্রার্থী হয়ে ঘরে-বাইরে এই অনাচারের প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করেছেন, আমজনতা আশা করে চিকিৎসককুল তাঁদের হারানো সম্মানের আসল পুনরুদ্ধারের এই সুযোগ হাতছাড়া না করে বিবেকবুদ্ধির প্রয়োগ মারফত একটি সৎ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ, দায়বদ্ধ মেডিকেল কাউন্সিল গড়ার কাজে মদত জোগাবেন। বিশেষত এই কারণে যে ইতিমধ্যেই কেতন দেশাই সহ প্রমাণিত দুর্নীতি পরায়ণ মতলববাজ গোষ্ঠীটি রাজ্যে রাজ্যে মেডিকেল কাউন্সিল দখল করার নোংরা খেলায় নেমে পড়ছে!

সমরেশ মিত্র

ঘটনা প্রবাহ

খাদ্যশস্যের বদলে নগদ টাকা

এদেশের সংবিধানে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলার আদর্শ ঘোষিত হয়েছিল। সরাসরি ভাবে খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলা না হলেও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে গেলে সকলের জন্য খাদ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যর ব্যবস্থা করা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। রেশন ব্যবস্থার মারফত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল-গম-চিনি-কেরোসিন ইত্যাদির সরবরাহ এরই অঙ্গ— যদিও যে রেশনব্যবস্থা এযাবৎ চলে এসেছে তা অত্যন্ত আংশিক ও খণ্ডিত চরিত্রের।

যাঁরা দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন, এবং যাঁরা তাঁদের মধ্যেও দুঃস্থ, সেইসব মানুষের জন্য সস্তায় চাল গম দেওয়ার ব্যবস্থাটি সাম্প্রতিক। এখন ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সস্তায় খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যবস্থাটি তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে নগদ টাকা দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে সাধারণভাবে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত অর্থাৎ বিপিএল (below poverty line) তালিকাভুক্ত মানুষদের জন্য সপ্তাহে মাথাপিছু দু-টাকা কেজি দরে এক কেজি চাল ও পাঁচ টাকা কেজি দরে ৭৫০ গ্রাম গম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এদের মধ্যে যাঁরা বেশি দরিদ্র তাঁদের

জন্য অন্ত্যোদয় যোজনা নামে একটি প্রকল্প আছে। এর আওতায় থাকা লোকদের জন্য সপ্তাহে মাথাপিছু দু টাকা কেজি দরে এক কেজি চাল ও দু টাকা কেজি দরে ৭৫০ গ্রাম গম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যাঁরা একেবারেই নিঃস্ব তাঁদের জন্য আছে অন্নপূর্ণা যোজনা। এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মাসে মাথাপিছু দশ কেজি চাল বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ভারত সরকার এখন এই সমগ্র ব্যবস্থাটি তুলে দিতে চাইছে।

খাদ্যশস্যের বিকল্প হিসাবে নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থাটি আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ একটি ব্যবস্থা। কিন্তু এর রূপায়ণে গুরুতর সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, দেশের সব রাজ্যে চাল গমের দাম সমান নয়। সুতরাং কাকে কত নগদ টাকা দেওয়া হবে তার পরিমাণ কী ভাবে স্থির হবে? খেয়ালখুশি মতো একটি টাকার অঙ্ক স্থির করে দেওয়া হবে কি? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই টাকা কীভাবে বিলি হবে? সরকারের বক্তব্য, ব্যাংকের মারফত এই টাকা দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাপককে একটি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এখন গ্রামাঞ্চলে এটি খুবই সাধারণ ব্যাপার যে অনেকক্ষেত্রে পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যে কোনও ব্যাংকের শাখা নেই। সুতরাং এই নগদ অর্থসাহায্যের প্রাপকদের প্রাপ্য অর্থ তুলতে গেলে দূর দূর থেকে ব্যাংকে এসে ভিড় জমাতে হবে, এবং তার একটা কাজের দিন নষ্ট হবে।

এটা বুঝতে কোনও বিশেষ জ্ঞান লাগেনা যে অত্যাবশ্যক পণ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার অভিঘাত বাজারের ওপর অবশ্যই পড়বে। অতীতে এটা বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে যে খোলাবাজারে অত্যাবশ্যক পণ্যের ঘাটতি অর্থাৎ যোগানের তুলনায় চাহিদার সাময়িক বৃদ্ধির সুযোগ নেয় কালোবাজারি ফাটকা-কারবারিরা। গণবণ্টন ব্যবস্থা তুলে দিলে, অর্থাৎ রেশন ব্যবস্থা মারফত চাল গম দেওয়া বন্ধ করে দিলে যে এদের সুবিধা হয় তা আগে বহুবার দেখা গেছে। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের একটি বড় কারণ ছিল খোলাবাজারে চালের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়া। কারণ, রেশনে চাল দেওয়া হচ্ছিল না। খাদ্য আন্দোলনের আগে ও পরে এটা একাধিকবার দেখা গেছে, যেমন ১৯৭৩-৭৪ সালে। ভারত সরকার এখন যেটা করতে চাইছে, তার ফলে খোলাবাজারে চাল-গমের দাম যে বাড়বে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এর অর্থ, নগদ আর্থিক সাহায্যের প্রকৃত মূল্য ক্রমশ কমতে থাকবে, এবং শেষে তা তলানিতে ঠেকবে।

এবারে একটি গুরুতর প্রশ্ন। কত শতাংশ লোক এই সাহায্যের আওতায় আসবে? সরকারের বক্তব্য, ৫০ শতাংশ অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমার সরকারি পরিমাপের নিচে যারা থাকবেন, তাঁদের বাইরেও একাংশ এই সুবিধা পাবেন। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে ভালো প্রস্তাব মনে হতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে দারিদ্র্যের সরকারি পরিমাপটি কতটা সঠিক।

১৯৭৩-৭৪ সালে দারিদ্র্য রেখা নির্ধারণ করা হয় পুষ্টির যোগানের ভিত্তিতে। ন্যূনতম পুষ্টির যোগান ধরা হয় গ্রামাঞ্চলে ২৪০০ ক্যালরি এবং শহরাঞ্চলে ২১০০ ক্যালরি। পরবর্তীকালে যোজনা কমিশন যে পরোক্ষ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য রেখার পরিমাপ করেছেন তাতে কার্যত পুষ্টির এই ন্যূনতম মাপকাঠিকে বর্জন করা হয়েছে।

উৎসা পট্টনায়ক জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (National Sample Survey)-র ৫৬-তম দফার তথ্য ব্যবহার করে পুষ্টির সঙ্গে মাসিক খরচের সম্পর্কের যে হিসাব করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে দৈনিক ২৪০০ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণের জন্য যে মাসিক খরচের প্রয়োজন তা করার সামর্থ্য ৮০ শতাংশেরই নেই।[১] ১৯৭৩-৭৪ সালে যোজনা কমিশন জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যকেই ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের সংখ্যাকে ৫৬.৪ শতাংশ ধরেছিলেন। কিন্তু পরে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য যোজনা কমিশন আর ব্যবহার করেনি, তার বদলে খেতমজুরদের জন্য গোঁজামিলে ভরা একটি মূল্যসূচক ব্যবহার করে এবং পুষ্টির ন্যূনতম মানের জন্য ক্যালরির মানদণ্ডকে কার্যত পরিত্যাগ করে দারিদ্র রেখার নিচে অবস্থিত মানুষদের অনুপাতকে বহুলাংশে কমিয়ে দেখিয়েছেন। তাদের মতে এখন দারিদ্র্যের অনুপাত মাত্র ২৭ শতাংশ।

অন্যদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য জাতীয় কমিশন (অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশন)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ভারতে যে সব মানুষের দৈনিক মাথাপিছু খরচ ২০ টাকার কম, ২০০৪-২০০৫ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ৮৩ কোটি ৬০ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৭৭ শতাংশ মানুষই ছিলেন হতদরিদ্র। এই হিসাবের সঙ্গে উৎসা পট্টনায়কের হিসাব মোটামুটি মিলে যায়। অর্থাৎ সরকারের আর্থিক সাহায্যের আওতার বাইরেও বহু মানুষ থেকে যাবেন।

একথা মনে রাখা উচিত যে খোলাবাজারে চাল গমের মূল্যবৃদ্ধির ফলে খালি বিপিএল তালিকাভুক্তরাই নন, বা আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্তরাই নন, যাঁদের চাল কিনে খেতে হয় এমন সব শ্রেণীর মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

এমনিতে বিপিএল তালিকা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, কারণ আর্থিক ভাবে ভারতীয় মাপকাঠিতে স্বচ্ছল এমন বহু লোকের নাম বিপিএল তালিকায় পাওয়া যাবে। সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ সংশোধনে গ্রাম সংসদকে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিপিএল তালিকা তৈরির দায়িত্ব গ্রাম সংসদের হাতে না দিয়ে আমলাতন্ত্রের হাতে দেওয়া হয়েছিল। সরকারের নয়া সিদ্ধান্তে যাঁরা উপকার পাবেন, তাঁদের তালিকা কীভাবে তৈরি হবে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

আর, একটি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কিন্তু বাস্তবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিয়ে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি শেষ করা যেতে পারে। বর্তমানে চালু গণবণ্টন ব্যবস্থায় পরিবারের যে কোনও সদস্যই রেশন কার্ড নিয়ে গিয়ে চাল গম কেরোসিন তুলতে পারবেন।

কিন্তু এই গণবন্টন ব্যবস্থা তুলে দিলে কেবলমাত্র পরিবারের কর্তা, সাধারণত যিনি পুরুষ, তিনিই ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবেন, কারণ অ্যাকাউন্ট থাকবে তারই নামে। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে এদেশের নিম্নবর্ণের পুরুষদের মধ্যে হাতে নগদ টাকা এলেই তা চোলাই মদ ইত্যাদির পেছনে খরচ করার একটি প্রবণতা রয়েছে। যে মহিলারা গেরস্থালি পরিচালনা করেন তাঁদের সজাগতা এদিকে অনেক বেশি। তাঁরা যদি চাল-গম তুলতে না পারেন, এবং পরিবর্তে যদি পুরুষরা ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন তাহলে নগদ আর্থিক সাহায্যের সবটা চাল-গমের পেছনে খরচ হবে কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এই অবস্থায় আজকের দাবি হওয়া উচিত, নগদ অর্থ নয়, এপিএল/বিপিএল নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে গণ-বন্টন ব্যবস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনতে হবে।

অনির্বাণ বিশ্বাস

সূত্র

১। উৎসা পট্টনায়ক, নিওলিবারালিজম এ্যান্ড পভার্টি ইন রুরাল ইন্ডিয়া, ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৮ জুলাই-৬ আগস্ট ২০০৭

ঘটনা প্রবাহ

মুম্বাইয়ের স্কুলগুলো বিক্রি হতে চলেছে

এবার মুম্বাইয়ের কর্পোরেশন স্কুলগুলো বিক্রি হতে চলেছে। বৃহৎ মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (BMC) ভারতের সবচেয়ে ধনী মিউনিসিপ্যালিটি। সারা দেশের এক তৃতীয়াংশ ট্যাক্স সংগৃহীত হয় এখানে; এমনকি মাথাপিছু আয়ও সারা দেশের গড় মানের দ্বিগুণ। বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য ছিল কর্পোরেশন স্কুলগুলোর মারফত উন্নতমানের শিক্ষাদান। প্রায় ৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী, ১১৭৪টি স্কুল এবং সাড়ে এগারো হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে হিন্দী, উর্দু, ইংরেজি ও দক্ষিণের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সহ মোট আটটি মাধ্যমে পড়াশুনা হয় এই স্কুলগুলোতে। এছাড়াও ১৮টি মানসিক প্রতিবন্ধীদের স্কুল ও ৫৫টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলও চালায় BMC । কর্পোরেশনের আয়ের ৮-৯ শতাংশ ব্যবহৃত হয় শিক্ষাখাতে, যা সত্যিই সারা দেশের গড় মানের তুলনায় বেশি। ছাত্রপিছু খরচের অঙ্কটাও নেহাৎ কম নয়; বছরে প্রায় ৩৭ হাজার টাকার কাছাকাছি। একেবারে হতদরিদ্র ঘরের ছেলে মেয়েরা, মূলত তপশিলি জাতি, উপজাতি বা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি, মুসলিম বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাই পড়ে এখানে। এহেন স্কুলগুলোকে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে আলোচনা ব্যতিরেকেই নিলামে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে তারা। একটা সাংবিধানিক সংস্থা তার সাংবিধানিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে চলেছে।

এই গোটা বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়াটি হবে PPP মডেলে। আমরা অতীতেও দেখেছি সরকার পরিচালিত নানান পরিষেবা ক্ষেত্র এই মডেল অনুসারে বেসরকারি সংস্থার হাতে বিকিয়ে গেছে। জনগণের অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং সম্পত্তি ক্রমশ ব্যক্তিগত পুঁজির কব্জাগত হয়ে চলেছে। এবার পালা স্কুল শিক্ষার। সরকারি স্কুল বেসরকারি হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে মুম্বাইয়ের কর্পোরেশনের স্কুল সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তটির মাধ্যমে। School Enhancement Programme এর নামে ইতোমধ্যেই UNICEF এবং BMC-র মধ্যে মউ স্বাক্ষর হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলো ঢুকে পড়বে শিক্ষার এই বিপুল 'বাজারে'। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে কোনো যুক্তিই অবশ্য দেখায়নি BMC। কেনই বা ১২৫ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েও উচ্চমনের শিক্ষা দিতে তারা পারঙ্গম নয়, কিংবা এটাই বা কীভাবে ধরে নেওয়া হলো যে মুনাফালোভী কর্পোরেট সংস্থাগুলো সেই মানের শিক্ষা দিতে পারবে?

গোটা দেশজুড়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিহাসটা খুব কমদিনের নয়। কিন্তু তবুও তাদের কেউই IIT, ISI বা JNU. ইত্যাদির মত সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মানের ধরে কাছে পৌঁছতে পারেনি; আর হাল আমলে নয়া উদারিকরণ নীতির হাত ধরে যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে তাদের মান ৭০-এর দশকের আগে তৈরি হওয়া বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারছে না। আর PPP-র নামে সেই অলীক স্বপ্নই দেখাতে চাইছে আমাদের সরকার। এই নীতি হলো বেসরকারিকরণের নয়া ফন্দি। পরিকাঠামো আর রসদের যোগান বন্ধ করে দিয়ে সরকারি ব্যবস্থাকে জনমানসে অদক্ষ প্রতিপন্ন করা হয় আর তারপর বেসরকারি সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে দক্ষ— এটা প্রচার করে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সরকার বিনা পয়সায় জমি দেয়, বিপুল ভর্তুকি সহ গোটা পরিকাঠামো, প্রয়োজনীয় ভবন সবকিছু তুলে দেয় তাদের হাতে, বিনা পয়সায় জল, ইলেকট্রিক দেয়, এমনকি ট্যাক্সেও ছাড় দেয় পরিষেবার নামে, SC/ST ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার খরচও সরকার দেয় বেসরকারি পার্টনারদের লাভের জন্য। এককথায়, জনগণের সম্পদের ওপর বসে বেসরকারি পুঁজিপতির তৈরি হয় মুনাফার পাহাড়।

শিক্ষাকে পণ্য করে তুলতে গেলে প্রথমেই লাগে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যবৃদ্ধি আর ব্যবস্থাটাকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেওয়া। এতে দেখানো যায় সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। আমরা যদি কলকাতা কর্পোরেশনের দিকে তাকাই তাহলে এই ঘটনাটাই দেখতে পাব। বহু কর্পোরেশন স্কুল তুলে দেওয়া হয়েছে, সরকারি স্কুলগুলো ধুঁকছে। মুম্বাইয়ে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে কলকাতা সহ দেশের অনেক জায়গাতেই সরকারি স্কুলগুলোকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার পথ প্রশস্ত হবে, যা সকলের শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক ঘোষণার পরিপন্থী।

অরিজিৎ

বস্তার জ্বলছে

২৫ মে ছত্রিশগড়ের দরভাঘাটিতে মাওবাদী আক্রমণে মারা গিয়েছেন ছত্রিশগড় রাজ্যের কংগ্রেস দলের প্রথম সারির প্রায় সব নেতা। সংবাদে প্রকাশ, 'সালভা জুদুম' প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্র কর্মাই ছিলেন মাওবাদী সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান টার্গেট। তিনি জীবদ্দশায় জেড প্লাস নিরাপত্তা ভোগ করতেন। মারা গেছেন ছত্রিশগড় রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি নন্দকুমার প্যাটেল। ছত্রিশগড়ের জঙ্গলে যখন আধাসামরিক বাহিনী নামানো হয় তখন নন্দকুমার প্যাটেল ছিলেন সে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'সালভা জুদুম' বেআইনি ঘোষণা হয় মুখ্য বিচারালয়ের এক আদেশে। আসলে 'সালভা জুদুম' বন্ধ হয়েছে কাগজে কলমে। এসপিও বা স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের নিরস্ত্র করা হয়েছে, কিন্তু অন্য নামে তা ফিরে এসেছে। 'আর্মড অক্সিলারি ফোর্স' নামে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। 'সালভা জুদুম' এর বীভৎস নিপীড়ন নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সংক্ষেপে দু এক কথা বলা আশা করি দোষের হবে না।

বস্তারের ৬৪৪ টি গ্রামের প্রায় ১৫০০০০ আদিবাসীকে তাদের গ্রাম থেকে জবরদস্তি তুলে এনে অস্থায়ী শিবিরে শিবিরে রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রায় এক হাজার মানুষ মারা যান। অগণিত ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। শিশুদের জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হয়, পাথরে আছড়ে মারা হয়। এমনকি কিছু বয়স্ক চলচ্ছক্তিহীন মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়। আর এ সবই করা হয় আদিবাসীদের ভয় দেখানোর জন্য। যাতে তারা আর মাওবাদীদের সমর্থন না করে। আর এসবের জন্য শুধু মহেন্দ্র কর্মাকেই দায়ী করা যায় না। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি-র রমন সিং বা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর 'সালভা জুদুম' পরিকল্পনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। মুখ্য বিচারালয়ের কয়েকদফা আদেশ সত্ত্বেও দোষীদের কোন শাস্তি হয় নি বা ক্ষতিগ্রস্তদের কোন ক্ষতিপূরণ মেলে নি।

২৫ মে দরভাঘাটির ঘটনার কয়েকদিন আগে ১৭ মে এডেসমেটা গ্রামে ৮ জন আদিবাসী পুলিশের গুলিতে নিহত হন। পুলিশ বলে, তারা মাওবাদীদের সংঘর্ষে হত্যা করেছে। আসলে এরা ছিল সাধারণ গ্রামবাসী। পুলিশ-আধা সামরিক বাহিনী 'আর্মড অক্সিলারি ফোর্স' মারফত খবর পেয়েছিল গ্রামে সশস্ত্র মাওবাদীরা জড়ো হয়েছে। ২০১২-র জুনে সারকেগুড়ায় একই ভাবে ১৭ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে পুলিশ-আধা সামরিক বাহিনী। সেই সময় তারা জড়ো হয়েছিল 'বীজ পনদুম' নামে ফসল বোনার উৎসবে। ২০১১-র মার্চে তাড়মেটলা গ্রামে একই ভাবে আক্রমণ চালিয়ে পুলিশবাহিনী প্রায় ৩০০ ঘর পুড়িয়ে দেয়। গ্রামবাসীদের হত্যা করে এবং মেয়েদের ধর্ষণ করে। আর এসব কারণেই প্রধান সংবাদপত্রগুলি মহেন্দ্র কর্মাকে চিত্রিত করেছে প্রায় গেস্টাপো সর্দার হিসাবে। কিন্তু রাষ্ট্র তাকে শহিদের মর্যাদা দিয়েছে। অন্ত্যেষ্টির সময়ে 'গান স্যালুট' দিয়ে সম্মান জানিয়েছে।

উন্নয়নের নামে প্রান্তিক বা আদিবাসী উচ্ছেদ আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের অধীন বৃহৎ জলাধার তৈরিই হোক বা নর্মদার ওপর বাঁধ নির্মাণই হোক। উচ্ছেদ হয়েছেন প্রান্তিক ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিবাসী মানুষ। তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে ইতিমধ্যেই তা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৯০-এর পর নব্য উদারনীতি চালু হবার পর এ সবই বেড়েছে লাগামহীন ভাবে। ১৯৯০-পূর্ববর্তী বড় প্রকল্পগুলি সাধিত হতো প্রধানত সরকারি উদ্যোগে। আর ১৯৯০-এর পর ভারতের বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের রথে সওয়ার হওয়ার পর জল-জমি-জঙ্গল-কৌম সম্পদের দখল নিতে চায় পুঁজিপতিরা। তাদের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা আরও মুনাফা। আর পুঁজিপতিদের এই উদগ্র মুনাফা আকাঙ্ক্ষার সহচর জাতীয় বা রাজ্যভিত্তিক সব রাজনৈতিক দলই। এমনকি সাংবিধানিক বামপন্থীরাও। পশ্চিমবঙ্গ-কেরলে ক্ষমতাচ্যুত হবার পরও পুরোনো ভুল শোধরাতে পেরেছেন এমন ভাবার কোন কারণ নেই।

উড়িষ্যার নিয়মাগিরি পাহাড়ে বেদান্ত গোষ্ঠীর অ্যালুমিনিয়াম প্রকল্প চালু করার জন্য নবীন পট্টনায়কের উৎসাহে কোন ঘাটতি ছিল না। বাদ সেধেছে মুখ্য বিচারালয়ের সাম্প্রতিক আদেশ। যেন তেন প্রকারেণ পস্কো প্রকল্প চালু করতে লাঠি-গুলি-উচ্ছেদ কোন কিছুতেই পিছপা নন তিনি।

২০০৩ সালে খনি শিল্পে উদারীকরণ চালু হয়। খনিজ উত্তোলনের অনেক নিয়ম-নীতি শিথিল করা হয়। ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই বাস করেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ। শিল্পপতিদের সাথে 'মউ' সই করার বান ডাকে। যে নেতা-মন্ত্রী যত মউ সই করাতে পারবেন তার কমিশনের পরিমাণ তত বেশি হবে। আর এই সুযোগে নেতা-মন্ত্রীদের পুত্র-কন্যা-ভাই-ভাতিজারাও বনে গেলেন শিল্পপতি। টাকার ক্ষমতা তো ছিলই। সঙ্গে যোগ হল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মদত। ইউপিএ-১ এবং ২-এর জমানায় এমন একটাও কেন্দ্রীয় দপ্তর পাওয়া যাবে না যে দপ্তরের বিরুদ্ধে কোন না কোন ঘোটালা-আর্থিক কেলেংকারি বা উৎকোচ গ্রহণের ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। অথচ ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক করার মত প্রধানমন্ত্রী জপে চলেছেন 'নকশালবাদই আমাদের সবচেয়ে বড়ো অভ্যন্তরীণ বিপদ'। দুর্নীতি-আর্থিক কেলেংকারি-ঘোটালা তাঁর কাছে কোন বিপদ নয়। ৪২ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার— এটা কোন জাতীয়

বিপদ নয়। খোদ রাজধানীতে মহিলারা নিরাপদ নন— এটা কোন জাতীয় বিপদ নয়।

আবার দারিদ্র্যই শুধুমাত্র মাওবাদের উর্বর ক্ষেত্র, এ কথাও বলা যাবেনা।

সর্বাধিক দরিদ্র মানুষের বাস এরকম ১০০টি জেলার মধ্যে ২৬টি জেলা সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী মাওবাদী অধ্যুষিত। শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি এরকম ১০০টি জেলার মধ্যে মাত্র ৯টি জেলা মাওবাদী অধ্যুষিত। সবচেয়ে বেশি ক্ষুধাপীড়িত ১০০টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলা মাওবাদী অধ্যুষিত। তাহলে কেবলমাত্র দারিদ্র্য দিয়ে মাওবাদীদের বাড়বাড়ন্তের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। সরকার ও প্রশাসনের প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করে শাসিত জনগণের প্রতি তার দায়বদ্ধতার উপর। সরকার যখন জমি মাফিয়া, ধনপতি, পুঁজিপতি, লুটেরাদের প্রকাশ্য সেবাদাস হয় তখন সে প্রাসঙ্গিকতা হারায়। যাদের জল-জমি-জঙ্গল-কৌম জীবন লুঠ হয় বা জীবন ধারণের অবলম্বন কেড়ে নেওয়া হয়, তারা বিদ্রোহের রাস্তা নেয়। ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ মধ্যভাগে মাওবাদী সাফল্যের অন্যতম কারণ এটাও হতে পারে।

কয়েক বছর আগে ভাবা হয়েছিল, ঝাড়খণ্ড-উড়িষ্যা সীমান্তে সারান্ডা জঙ্গলে (যা আবার লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ) সারান্ডা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় আদিবাসী মানুষের আস্থা অর্জন করা যাবে। সাময়িক কিছু ফলও পাওয়া গিয়েছিল। এখন ১৫০০ হেক্টরের বেশি জঙ্গল জিন্দল পাওয়ার এণ্ড স্টিল কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জয়রাম রমেশের আশ্বাস বা বনাধিকার আইনের থেকে খনি মাফিয়া-পুঁজিপতি-শিল্প মালিক-রাজনৈতিক জোট অনেক গুণ শক্তিশালী। 'সারান্ডা উন্নয়ন পরিকল্পনা' পরিণত হয়েছে সারান্ডা ব্যবসায়িক পরিকল্পনায়।

ছত্রিশগড়ের বস্তার অঞ্চলের আদিবাসীদের ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা কাটানোর জন্য উদ্যোগের অভাব নেই। ২০১১ সালে দান্তেওয়াডাতে পা রেখে জনৈক কালেক্টার ১০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা পেশ করেন। জেলা সদরে স্কুল, হোস্টেল, পলিটেকনিক গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সঙ্গে ক্রিকেট মাঠ ও অডিটরিয়াম। কাজ শুরু হয় ঝড়ের গতিতে। সপ্তাহান্তে গ্রামের পাঠশালাগুলি থেকে বাসে ছাত্রদের নিয়ে এসে সমাজের মূলস্রোত বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন কাজের সঙ্গে পরিচিত করানোর কাজও শুরু হয়।

২৫মে ২০১৩-র ঘটনার দুদিন পর সিআরপিএফ তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক বস্তার থেকে ২০০০ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে। বস্তারের প্রতিটি জেলা থেকে ২৮০ জন কনস্টেবল নিয়োগ করার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়। পরবর্তী তিনদিনে সুকমা থেকে মাত্র ৮৬ জন, দান্তেওয়াড়া থেকে ২৩৩ জন (যাদের মধ্যে অর্ধেক আদিবাসী নয়) কনস্টেবল নিযুক্তি প্রক্রিয়ার সমিল হয়। আদিবাসীদের সমর্থনের শক্তি জমির ওপর মাওবাদীরা দাঁড়িয়ে আছেন একথা অন্তত নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এই পরিস্থিতিতে সরকার আরো আধাসামরিক বাহিনী নামানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতিধ্যেই সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার নজরদারি চলছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোন সুফল পাওয়া যায় নি।

আর অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি বাহিনীর দমন-পীড়ন বিদ্রোহীদের সারিকে দীর্ঘ করে। লাতিন আমেরিকার বহু দেশে আদি অধিবাসীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছেন বহু বছর ধরে বা এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কোথাও সেই যুদ্ধ পরাজিত হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে শুরু হওয়া মেকসিকোর চিয়াপাস বিদ্রোহ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এখনও সে যুদ্ধ জারি আছে। কিন্তু মেকসিকোর শহরের শ্রমজীবী মানুষ, বস্তিবাসী মানুষ একই ভাবে বিদ্রোহের ঝান্ডা উড়িয়েছেন একথা বলা যাবে না।

আপাতত আমাদের নীতিপ্রণেতারা সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বস্তার পরিস্থিতি মোকাবিলার সম্ভাবনা নাকচ করেছেন। যদিও সে সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেনাবাহিনীর জনৈক অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ারের মতে "Should the army be inducted to control the situation? Considering the prevailing situation, the military– if deployed– will be in collision with the politician/bureaucrat/industrialist nexus. The situation, such as it is, may even politicize and corrupt the force."

ব্যবহৃত তথ্যগুলি *দ্য স্টেটসম্যান*, ১৫/৬/১৩, *আউটলুক* জুন ১০, ২০১৩ এবং *অনীক* সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮১ থেকে নেওয়া।

শ্যামল দাস

স্মরণ

গত ৩ জুন, ২০১৩ বামপন্থী ও কমিউনিস্ট একনিষ্ঠ কর্মী, কমরেড দিলীপ চক্রবর্তীর জীবনাবসান ঘটেছে ৬৮ বছর বয়সে। ১৯৬০-এর দশক থেকেই তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত। যুক্ত ছিলেন নকশালবাড়ি আন্দোলনে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকাহত অনীক তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

কবিতা

বন্ধু সহযোদ্ধা কমরেড দীপংকর

জয়ন্ত বিশ্বাস

কৃষ্ণনাথ কলেজে
ঈশান কোণে নাগকেশরের
গাছের তলায়
গঙ্গোত্রীর কলোচ্ছ্বাস
প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ, অশোকতরু
লাল লাল রাঙা বট ফল।
ষাটের দশক
আমরা স্বপ্ন দেখতাম— সমাজ ক্রান্তির

গ্রামের আলপথে মাঠে মাঠে
হেঁটেছি অনেক
সঙ্গে ছিল বীর যোদ্ধা
বন্ধু দীপংকর
ভিপিতে অনীক পৌঁছাতো,
পৌঁছে যায় নিয়মিত
প্রত্যন্ত গ্রামে
মার্কস্ থেকে মাও
সাহিত্য শিল্প সমাজতত্ত্ব
অর্থনীতির গূঢ় বিশ্লেষণ
সর্বত্র অনীকের প্রজ্ঞা
ও বোধিক চেতনায় উদ্ভাসিত, মনন বিজ্ঞান।

দীপংকর নিষ্ক্রমণ
অসময়ে দুঃসময়ে।
উদ্ভিদ সদৃশ ধূসর দেশে
অনীক রাস্তায় রাস্তা খুঁজতে শিখিয়েছে।

সিন্দুর

বিশ্বজিত সেন

এই যে তুমি তীর্থগুলো দেখে শুনে সামলে রাখো
মাঝে মাঝে কী ছাইপাঁশ গায়ে মুখে মাথায় রাখো
এতে কি সৌন্দর্য বাড়ে, নাকি সমাজ ভোল পাল্টায়
কারো এতে কি ফায়দা হয়, তুমিই ভালো বলতে পারো।

সারাটা দিন শুয়োর খেদাও, শস্যগুলি সেই তছনচ
হরে দরে একই রকম, একই প্রকার, একই বিকার কথায় কথায়
পুরনো দিন চোখে আঙ্গুল, কানে আঙ্গুল, গলায় আঙ্গুল
দিয়ে দেখাও, হাড় বদমাস মানুষ তবু বুঝতে চায় না।

এই যে তুমি ঝাঁ চকচক বাংলা গড়ার অলীক স্বপ্নে
হাঁটি হাঁটি পা পা চলো, মোদের বলো, ''নে, ভাগ নে''
ভাগ নেব যে হাতটি কোথায়, আঁজলা পেতে কী করে ধরি
শুনতে নারাজ, বলছো তুমি, 'পাত তো পাতা তোদের সামনে।'

ভালোই তো, এই তীর্থগুলো সামলে সুমলে আগলে রাখো
সবাই পুনঃ বশংবদ, আশায় আশায় আশায় থাকো।

চাঁদ পোড়ে

অজয় সেন

শেষ রোদ
নিভে গেলে মেঘের বাসরে,
স্তব্ধতাকে ডেকে নেয় : নদী—
নারী, গণিকার অন্ধ সেতারী;

মুখছবি আঁকে রাত,
ন্যুব্জ চাঁদ ভাঙে জলসিঁড়ি...

রাতের আলাপে মেতে ওঠে।
তখন কঠোর হাত
কুমিরের দাঁত ছিঁড়ে
জেগে ওঠে অগ্নিজঠরে :
মা! আমি অনাহারী;
দূরে কাছে
চাঁদ পোড়ে ক্ষুধার পাহাড়ে।

অন্য চোখে

কে কার অলঙ্কার

মালবিকা মিত্র

শারজার মাঠ। কয়েক কোটি চোখ টিভির পর্দায় স্থির, নিষ্পলক, শ্বাসরুদ্ধ। ৪৯.৫ ওভার, শেষ বল বাকি। জয়ের জন্য চাই আর চার রান। ব্যাট হাতে জাভেদ মিয়াদাঁদ, উল্টোদিকে বল হাতে চেতন শর্মা। একটা ফুলটস। ব্যাস, বল আকাশপথে মাঠের বাইরে। অথবা বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শেষ বলে আব্দুল কাদিরের চার রান। জয়। এই টানটান উত্তেজনা উপভোগের জন্যই তো খেলা দেখি। আপাতত এই উত্তেজনা বিদায়; কারণ ছয়/চার খেলোয়াড় মারে না, তাকে মারার মতো বল দেওয়া হয়। ঐ ওভারে কত রান দেওয়া হবে সেটা পূর্ব-নির্দিষ্ট। ক্যাচ-মিস্, মিস-ফিল্ডিং, এ সবই পূর্ব-নির্দিষ্ট। এই সব একটা লুস বলের ভাল দাম, ১০/১৫ লাখ টাকা, ক্যাচ মিস বা মিস ফিল্ডের দাম কয়েক লাখ। জেতার জন্য নৈপুণ্য প্রদর্শন নয়, হারার জন্য। আর এই খেলাটা দেখবো চার ঘণ্টা বসে? কখ্খনো না!

ভাববেন না এমনি এমনি কেউ হারতে চায়। এতো কর্ণ নয় 'যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যাজিতে মোরে কোরো না আহ্বান... আমি রব ব্যর্থ আর হতাশের দলে'। ট্রাজিক হিরোর ম্যাচ ছেড়ে দেওয়া নয়। জিতে যদি পাই দশ লাখ, ছেড়ে দিয়ে পাবো এক কোটি। হারের খেলা চলছে মাঠে। আসল জেতার খেলাটা তো মাঠের বাইরে। বুকিরা ম্যাচের কতগুলো ওভার, ম্যাচের ফল এসবের ওপর বেটিং চালাচ্ছে... সেই অনুযায়ী মাঠে খেলা হবে। সমগ্রটাই বাজিকরের খেলা। আর এটার গালভরা নাম আইপিএল, দেড় মাস ধরে এই খেলা দেখছে সবাই। জঘন্য!

মনে হচ্ছে, বেটিং-ম্যাচফিক্সিং-স্পটফিক্সিং শব্দগুলো নতুন শুনছেন? হ্যানসি ক্রোনিয়ে, অজয় জাদেজা, আজহারউদ্দিন, সলমন বাট নামগুলো পুরোনো। সহজ কথাটা বোঝেন না, বুঝতে চান না; পাঁচদিন ব্যাপী সুদীর্ঘ ক্রিকেটে বাজিকরের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না। সাড়ে চারশো পাঁচশো ওভার, বেটিং হয় না। তারপর যখন ওয়ান-ডে ক্রিকেট এলো, পঞ্চাশ একশো ওভারকে হস্তগত করা সম্ভব হলো। আর কুড়ি ওভারের খেলাটা পুরোপুরি বাজিগরের পকেটে। সাদা চোখে দেখছি, শত শত কোটি টাকা ঢালছে বাজিগর শাহরুক খান, জুহি চাওলা, শিল্পা শেঠি, প্রীতি জিন্টা। ওদের বয়ে গেছে। ম্যাচে টিকিট বিক্রি-স্পনসর-বিজ্ঞাপনে পয়সা ওঠে না। আইপিএল বিনোদনে ওরা খেলোয়াড়ের দর হাঁকে, মাঠের পাশে লাফায়, এসবই ছবির চিত্রনাট্য। খেলোয়াড়দের মতই গতশ্রী নায়ক-নায়িকাদের দর নির্দিষ্ট। আসল পয়সা আসে আরব সাগরের একূল-ওকূলের আন্ডারওয়ার্ল্ড থেকে। এই বেহিসাবি অর্থ ঢালছে মুম্বাইয়ের সিনেমা শিল্পে, এই অর্থ সিনেমার নায়ক নায়িকার হাত ঘুরে আইপিএলে। আইনি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জুয়ার বোর্ড আইপিএল। বেটিংটা চলছে আন্তর্জাতিক বাজারে। তবেই তো লাভ। তথ্যপ্রযুক্তি-টেলিকম-গ্লোবালাইজেশন জুয়ার বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে। আর এটার লাভের বহর দেখে বেটিং চক্র ফুটবলের আইপিএল আনতে চাইছে টেনিসেও।

ভাবুন, এক একটা দলের দাম ৩০০/৪০০ কোটি টাকা। আইপিএলের ব্র্যান্ড ভ্যালু ১৫ হাজার কোটি টাকা। একজন ক্রিকেটার জানে, তাকে যোগ্যতার দাম হিসেবে অত টাকা দেওয়া হয়নি। আইপিএলের হাঁড়িকাঠে মাথা গলানোর দাম। জবাইয়ের দাম আলাদা। নিয়ন্ত্রণহীন এই ধরণীর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতি নিয়ে জুয়া হয় না, দরকার রেসের মাঠের সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত গতি। অতএব, টেস্ট ক্রিকেটের চেয়ে ওয়ান-ডে ভাল; আবার ওয়ান-ডের চেয়ে ফোরটুয়েন্টি ভাল। সিনেমা-জুয়া-বেটিং-রেসের মাঠ একাকার। অজিত সুরেখা ওরফে আমন, রেসের মাঠের মামুলি জুয়াড়ি থেকে বি গ্রেড সিনেমা প্রযোজক, তারপর বর্তমান আইপিএলের সুবাদে ক্রিকেট জুয়াড়ি। ২৩শে মে ২০১৩ উল্টোডাঙ্গায় গৌরীবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার। একেবারে সোনায় সোহাগা।

প্রথমে মনে হলো, এই টুর্নামেন্ট থেকে বহু আঞ্চলিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটবে; তাছাড়া ছোট প্রতিভাবান অনেকেই জাতীয়-আন্তর্জাতিক বাজারে স্বীকৃতি পায় না, দাম পায় না। আইপিএল কিছুদিন দাম দেবে। সেই সাথে ক্রিকেট-মোদী দর্শকের বিনোদনও হলো, মন্দ কি। এখন তো দেখছি...।

'এখন তো দেখছি' না... প্রথম থেকেই গ্যাঁড়াকল। আচ্ছা, ভাল মোটরচালকের প্রতিভা খোঁজার সময় নিশ্চয়ই আপনি চালকের চোখ বেঁধে পরীক্ষা নেন না। বল না দেখে শুরু থেকে সব বলে চালিয়ে খেলে, ব্যাটের কানায় লেগেও ছয় হয়, কী বলবেন, প্রতিভাবান? ভাল শট্? গেইল-ইউসুফ-পাঠান-মাইক হাসিরা দু-একটা খেলায় বাজিমাত করে, বেশিটাই ফ্লপ শো। 'হয় ছক্কা নয় অক্কা' এই মানসিকতায় প্রতিভার পরিচয় মেলে না, মানসিকতাটাই জুয়া খেলা। এই জুয়ায় ক্রিকেট নেই, তাহলে ক্রিকেট-মোদী মাঠে যাবে কেন? যায় না। যায় কিছু হুজুগে-উন্মত্ত-উদ্দাম ছেলে-ছোকরার দল। আর যায় উঠতি হঠাৎ বড়লোক পরিবার, যারা শুরু থেকেই খুশিতে আনন্দে দুলতে থাকে। অ-ক্রিকেট বিনোদন। এতদিন দেখতাম ছোট ছেলেমেয়েরা ক্লাসের ফাঁকে ক্লাসে বসেই ক্রিকেট খেলে নিত। বেঞ্চটা হতো পিচ, স্কেল-জলের বোতল হতো ব্যাট আর কাগজে গার্ডারে জড়িয়ে বল। সেদিন ক্লাসে টিচার নেই, প্রবল হইচই। ব্যাপার কী? জানলাম, একদল চিয়ার গার্লস হয়েছে, লাফাচ্ছে। রাজহংস, বিনোদনের সারাংশটুকু বেছে নিয়েছে। আর বাকি রইলো আঞ্চলিক প্রতিভার স্বীকৃতি ও দামের প্রশ্ন।

দাম তো দিচ্ছেই, বাজারদরের চেয়ে ঢের বেশি দিচ্ছে। আর আঞ্চলিক প্রতিভাকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিদেশি আর ক'জন! শচীন-রাহুল, ধোনি-গম্ভীর-শেহবাগ বাদ দিলে তো আঞ্চলিক প্রতিভার ছড়াছড়ি, পাড়ার ক্রিকেট। তা নিয়ে আন্তর্জাতিক জুয়া চলে না। তাই শোভাবর্ধক শাহরুখ-শিল্পা শেঠি-জুহি-প্রীতি চাই; তেণ্ডুলকর-দ্রাবিড়-ধোনি-গম্ভীরকেও চাই, শোভাবর্ধক। আসল খেলা খেলবে আঞ্চলিক প্রতিভা। একজন ক্রিকেটার ডাংগুলি খেলে প্রতিভা দেখাতে পারবে না। অতএব এই খেলা থেকে তার ক্রীড়া ভবিষ্যত নেই। টেস্ট ওয়ান-ডের জাতীয় দলে ঢোকাটা ভিন্ন আখ্যান। অতএব আইপিএল মঞ্চ, এখানেই শুরু এখানেই শেষ। বেটিং চক্র-জুয়াড়ি-বুকি তো এই খেলোয়াড়কেই চায়।

এক ওভারে ১৮ রান চাই? বেশ, হবে। ক্যাচ ফস্কাবে। নো বল-ওয়াইড হবে। আঞ্চলিক ক্রিকেটাররা সত্যিই তো আইপিএলের নয়নের মণি। তারাই তো বাধ্য ছেলে। সুতরাং প্রতিভা সন্ধান, তার দাম ও স্বীকৃতি-বিনোদন সবই হলো। আপনি তৃপ্ত তো?

এটা যদি শুরু থেকেই হাজার হাজার কোটির জুয়া হয়, আমার বাজির ঘোড়া, কেনা ঘোড়া বৃহৎ টিমে ঢুকলো ঠিক আছে, এগারো জনের দলে ঢোকা নিশ্চিত নয়। দল তো ঠিক হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, তাহলে? হুঃ, এই বুদ্ধিতে জুয়ার বোর্ড চলে না, আর আন্তর্জাতিক বেটিং চক্র! আমার বিশ্বস্ত ঘোড়া যাতে এগারো জনের দলে থাকে তার জন্য একজন নয় অনেক ঘোড়া হাতে থাকবে। শ্রীসন্থ-চণ্ডীলা-চহ্বান একই দল রাজস্থান রয়্যালস এর খেলোয়াড়। আবার বলি, রাজস্থান রয়ালসের প্রথম দলে স্থান হল না গতবছরের সদস্য অমিত সিং-এর। অতঃপর 'অতিরিক্ত সদস্য' হিসেবে তাকে নেওয়া হল দলে। অতএব দলে কে থাকবে থাকবে না সেটাও ঠিক করবেন গৌরী সেন। পুলিশ এই অমিত সিংকেও গ্রেপ্তার করেছে, বুকি অমিত কুমার। বাদ গিয়েও 'অতিরিক্ত সদস্য'। ভালো প্রতিভাধর অমিত, গুজরাটের রঞ্জি দলে খেলেছে। ২০টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ৫২ উইকেট পেয়েছে। একই দলে চারজন 'বুকড'। আরও আছে, সব দলে আছে! এদের টিমে রাখতে কত আইন! দুটোর বেশি বিদেশি নয়, তো চারটের বেশি জাতীয় খেলোয়াড় নয়। 'বুকড' খেলোয়াড় শেষাবধি ঢুকবেই। যদি বা এরপরও মিস হয়, বিদেশি খেলোয়াড় বা জাতীয় খেলোয়াড় আছে। তারাও কেউ তুলসীপাতা নয়। কথা হলো, নকড়া দিয়ে যদি দান জেতা যায় কোন বোকা গাধা টেক্কা মারে? আবার প্রয়োজনে পাঁচকড়ার ওপর টেক্কা মারতে হয় কখনো। সব রকম অপশন জুয়াড়ির হাতে থাকা চাই। দলের কর্তা ব্যক্তিও কিন্তু বুক্‌ড।

গুরুনাথ মায়াপ্পন। চেন্নাই সুপার কিংস দলের সিইও। এইটুকু পরিচয়ে স্পষ্ট হবে না। ষষ্ঠ আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের ডাগ আউটে গুরুনাথকে দেখা যায়। ক্রিকেটারদের নিলামে চেন্নাইয়ের টেবিলে সে ছিল। দল মালিকের বৈঠকেও গুরুনাথ চেন্নাইয়ের প্রতিনিধি। দল মালিকের জন্য বরাদ্দ গোল্ড অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড নিয়ে তার অবাধ বিচরণ। এই গুরুনাথ ম্যাচ গড়াপেটায় জড়িত, পুলিশ অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে। চেন্নাইয়ের ম্যাচ চলাকালীন গুরুনাথের সাথে বুকি বিন্দু দারা সিংহের ফোনে কথা হয়। গুরুনাথ চেন্নাই দল সম্পর্কে বিন্দুকে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। স্পটফিক্সিং প্রকাশ পাবার পর দুজন বুকিকে এরাই দুবাই পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আইপিএলের বেশ কিছু ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক ধোনীর স্ত্রী সাক্ষীর পাশে বসেছিল বিন্দু দারা সিং। ম্যাচের পর পার্টিতেও উপস্থিত থাকতো বিন্দু। গুরুনাথ-বিন্দু এরা যে সে ব্যক্তি নয়। ভাবুন, তামিলনাড়ু পুলিশের চার অফিসার ও মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের তিন অফিসার চেন্নাইয়ের অভিজাত পাড়ায় গুরুনাথের বাংলোয় হানা দেয়। অফিসারদের ২০ মিনিট বাইরে বসিয়ে রেখে তারপর নিরাপত্তা রক্ষীরা প্রবেশের অনুমতি দেয়। চেন্নাইয়ের মেরিনা বিচে গুরুনাথের ৭০ ফুট লম্বা প্রমোদ-তরী, সব রকম বিলাসসামগ্রী মজুত। নিশ্চয়ই মেরিনা বীচের কিছু অংশও গুরুনাথের ব্যক্তিগত। বুঝলেন, আরবা সাগরের হাজার কিমি উপকূল ব্যাপী এই চক্র ছড়িয়ে, দাউদ ইব্রাহিম অবধি।

অবশ্য ধরা পড়ার পর সবাই মুখ ফেরায়। ধোনী এখন অবধি মৌন। আর ইন্ডিয়া সিমেন্ট্স জানিয়েছে, "গুরুনাথ মায়াপ্পন চেন্নাই সুপার কিংসের মালিক, সিইও বা টিম প্রিন্সিপাল নন... বোর্ড প্রেসিডেন্টের জামাতা হিসেবে টিম ম্যানেজমেন্টের একজন সাম্মানিক সদস্য মাত্র"। এই ঘোষণা থেকে স্পষ্ট যে বোর্ড সভাপতি শ্রীনিবাসনের জামাই পরিচয়টা তার উত্থানের কারণ। সেক্ষেত্রে শ্রীনিবাসনের দায়িত্ব থেকেই যায়। আবার ভুল। ভারতীয় ঐতিহ্যে কন্যা-জামাতা বড়ই স্নেহ-আদরের সম্পর্ক। মনে নেই, কুতুবউদ্দীনের জামাতা ইলতুৎমিস, নুরজাহানের জামাতা আসফ খান, কলবলের জামাতা নাসিরুদ্দিন, ইতমদদৌল্লার জামাতা জাহাঙ্গীর, হালের কানিমোঝি...বঢ়্‌ড়া। কখনো জামাইয়ের ক্ষমতায় শ্বশুর ক্ষমতাবান। আবার কখনো শ্বশুরের ক্ষমতায় জামাই ক্ষমতাবান। এটা আমাদের ঐতিহ্য। জামাইয়ের কারণে শ্রীনিবাসন কেন ক্ষমতা ছাড়বে? কেউ কখনো ছাড়েনি। জামাই, আইনত পুত্র, son in law!

সবটাই তো ধান্দা দুর্নীতি প্যাঁচ পয়জার ষড়যন্ত্র শুনছি। তাহলে ক্রিকেট খেলাটা হবে কখন? কী মুস্কিল। খেলতে গিয়েই সমস্যার সূত্রপাত। খেলোয়াড় খেলায় মন দিতে পারে না; খেলার আগের দিন বুকির (জিজু জর্নাদন) সাথে হোটেলে রাত্রিবাস। মাঠে নেমে চিন্তা, কখন টুপি সোজা থাকবে, কখন উল্টো; কখন জামার কলার ওঠাবে, কখন জামা গুঁজে রাখবে; কখন রিস্ট ব্যান্ড খুলবে... এ সবই হলো বুকির প্রতি সিগন্যাল। এগুলো মনে রাখতে গিয়েই ম্যাচ শেষ, খেলায় মন দেওয়ার সময় নেই। পুনে ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে অজিত চান্ডিলা সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। ফলে ওই ওভারে বাজিকরের খেলা হয়নি। অতএব দাও, অগ্রিম ২০ লক্ষ টাকা ফেরত দাও। এতেই তো সব বেরিয়ে এল গলগল করে... পচা

দুর্গন্ধ। চান্ডিলা খেলায় মন দিতেই বিপত্তি। তাছাড়া এরা খেলবে কেন? লক্ষ্য, টাকা উপার্জন। জাতীয় দলে ঢুকতেও কতজনকে কতভাবে খুশি করতে হয়। কোথাও খেলাটা বিচার্য নয়। ক্রিকেটারকে খেলিয়ে শ্বশুর-জামাইয়ের সহস্র কোটি টাকার সম্পদ লাভ। আর ক্রিকেটার সেখানে ডন ব্রাডম্যান হতে পারে না... ম্যা হুঁ ডন... দাউদ ইব্রাহিম। ভাবুন, জাতীয় দলের অধিনায়ক ধোনী চেন্নাই সুপার কিংসেরও অধিনায়ক। দলের মালিক ইন্ডিয়া সিমেন্টস-এর মালিক শ্রীনিবাসন। ধোনী ইন্ডিয়া সিমেন্টস-এর বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে ভাইস প্রেসিডেন্ট। ধোনীর সাথে বোর্ড প্রেসিডেন্ট শ্রীনিবাসনের গাঁটছড়া কোথায় ভাবুন। এই ধোনী 'হৃতি স্পোর্টসের' মালিক। 'হৃতি স্পোর্টস' জাতীয় দলের খেলোয়াড় সুরেশ রায়না, আর পি সিং, রবীন্দ্র জাদেজা ও প্রজ্ঞান ওঝার বাণিজ্য স্বার্থ দেখার এজেন্ট। অতএব জাতীয় দলে জায়গা এদের পাকাপোক্ত। এমন কি, এদের তিনজনই চেন্নাই সুপার কিংসের খেলোয়াড়। যে দলের মালিক শ্রীনিবাসন ও সিইও গুরুনাথ মায়াপ্পন। এর ভেতর কোথায় ক্রিকেট? কোথাও নেই। যে কোনো উপায়ে টাকা উপার্জন। 'এস ৩৬ স্পোর্টস এ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রাঃ লিঃ' কোম্পানির মালিক হলো শ্রীসন্থ। রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজের খাতায় বলা হয়েছে 'ভারতে ও বিদেশে বেটিং হাউস চালানো' এই কোম্পানির লক্ষ্য। আপনি ক্রিকেট খুঁজছেন?

প্রাক্তন আইসিসি সভাপতি এহসান মানি আইপিএলকে 'হাই রিস্ক জোন' আখ্যা দেন। প্রথম আইপিএলেই ললিত মোদী কেলেংকারি দুর্নীতির শুভ সূচনা করেন। অর্জুন রণতুঙ্গা স্পষ্ট বলেছেন, ''ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা আইপিএল-কে সমর্থন করায় আমি বিস্মিত। এর পেছনে ওদের আর্থিক স্বার্থ থাকতে পারে''। আইসিসি দুর্নীতি দমন শাখার প্রধান পল কনডোন ২০০৮-এর প্রথম আইপিএল থেকেই গড়াপেটা সংক্রান্ত তথ্য জমা দিয়েছিলেন। অতএব দোহাই, ভগবান বুদ্ধের মতো জরা-ব্যাধি-মৃত্যু দেখে বিচলিত হবেন না।

কী সংঘাতিক! সমস্তটাই প্রতারণায় পূর্ণ! একটা গণতান্ত্রিক দেশে মহা সমারোহে ধুমধাম করে প্রতারণা চললো মাসাধিককাল ব্যাপী। আমরা তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদ নিলাম। না মশাই, আস্বাদন একটু বাকি। এই সমগ্র টাকার খেলাটা সরকার আয়কর মুক্ত করে রাজকোষকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করল... কয়েকশো কোটি টাকা। এইজন্যই তো লোকে নাম দিয়েছে 'ইন্ডিয়ান প্রতারণা লিগ'। আপনি অবাক হয়েছেন, বোর্ড প্রেসিডেন্ট শ্রীনিবাসন... ইন্ডিয়া সিমেন্টস এর মালিক... চেন্নাই সুপার কিংসের মালিক... মহেন্দ্র সিং ধোনী... জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন... ইন্ডিয়া সিমেন্টসের সহ সভাপতি... চেন্নাই সুপার কিংসের ক্যাপ্টেন... ধোনীর কোম্পানিতে যারা কাজ করে তারা জাতীয় দলে বা চেন্নাই সুপার কিংসে স্থান পায়.. প্রাইভেট টিউটরের হাতে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় নম্বর। আবার শ্রীনিবাসনের জামাই গুরুনাথ বেটিং-এ বিন্দু দারা সিংয়ের সাথে যুক্ত... বিন্দু দারা সিং আবার ধোনীর স্ত্রী সাক্ষীর বন্ধু। কি? সব ঘেঁটে ফেলেছেন নাকি? এ হলো সেই মেনু... আলুমটর... পনীরমটর... আউর ঢের সারি মটর!

হ্যাঁ প্রতারণা প্রসঙ্গে বলি, আপনার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা কি আইপিএলের কম কিছু! আমরা জানি, গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-আম্বানি-টাটা-গুরুনাথ-শ্রীনিবাসন-রামা কৈবর্ত-হাসিম শেখ সকলের একটা মাত্র ভোট। সকলের ইচ্ছার প্রতিফলন আমাদের সরকার। কিন্তু যাকে ভোট দিলাম তাকে আমি মনোনীত করিনি, করেছে দল। আমি নানা দলের বাছাই করা মাসতুতো ভাই 'চাঁদের হাট' থেকে একজনকে নির্বাচিত করে থাকি। আমরা বলি, 'ভোটের পর প্রার্থীরা নো পাত্তা'। হবেই তো। দল মনোনয়ন দেয়, তাকে খুশি রাখলেই হবে। বণিক ভোটের খরচ জোগায়, তাকে খুশি রাখলেই হবে। আবার ভাবুন, ভোটের আগে ইউপিএ-র বিরোধিতা করলাম, কিছু আসনে জিতলাম। তারপর জোট সরকার গঠনের খেলায় ইউপিএ-কে সমর্থন করলাম... নীতি-প্রতিশ্রুতি সব জলাঞ্জলি। ভোটদাতা নাগরিক অসহায়। প্রতিনিধির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

বলা হয়, আইনসভা হলো সার্বভৌম। বাস্তবে জনপ্রতিনিধিরা সংসদে নিজ নিজ দলের চিৎ করা কচ্ছপ, সব দলের সংসদীয় কমিটি আগেই ঠিক করে রাখে কে কী বলবে, কে বক্তব্য সমর্থন করবে, কে বিরোধিতা করবে, কখন সভা পণ্ড করা হবে, সব ছক কষা।

আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যু হলেও প্রতিনিধি সে বিষয়ে সোচ্চার হতে পারে না। ভাবুন, বিরোধী দলনেতা একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমান মর্যাদা ভোগ করেন। নিরপেক্ষ স্পিকার আইনসভা পরিচালনা করেন। তিনিও ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমমর্যাদা সম্পন্ন। নিরপেক্ষ! দলের প্রতীকে জিতে নিরপেক্ষ! পাঁচ বছর পর আবার দলের প্রতীকে লড়বে। শাসকদলের সাধারণ প্রতিনিধি অপেক্ষা মন্ত্রীসভার সদস্যদের ক্ষমতা বেশি। মন্ত্রীদের মধ্যে ফুল-মন্ত্রীর গুরুত্ব বেশি। ফুল-মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তরের কৌলিন্য আছে, অর্থ-স্বরাষ্ট্র-প্রতিরক্ষা ইত্যাদি। এদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর কিচেন ক্যাবিনেট। নাগরিক তার প্রতিনিধির নাগাল পায় না! আর প্রতিনিধি অসংখ্য বৃত্তবলয় ভেদ করে ক্ষমতা কেন্দ্রের নাগাল পায় না। এখানেও শেষ নয়, সব মন্ত্রীর দপ্তরে আছে বিভাগীয় সচিব, সহায়ক, আন্ডার সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি, প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর ইত্যাদি। আছে রাজ্যপাল-রাষ্ট্রপতির অনুমতি। আছে গৃহীত আইনের বৈধতা বিচার... হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট। এত ছাঁকুনি আছে বলেই তো জনস্বার্থে (টাটার স্বার্থে) সহজে জমি নেওয়া সম্ভব; আর অনিচ্ছুক চাষির জমি ফেরত দেওয়া অসম্ভব।

কি? আপনার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা কি আইপিএল-এর কম কিছু? একটাই লিগ, ইন্ডিয়ান প্রতারণা লিগ। এমন গণতন্ত্রের শ্রী বৃদ্ধি ঘটাতে পারে শ্রীসন্থ...শ্রীনিবাসন... ছাড়া আর কে? সোনার হাতে সোনার কাঁকন।

চিটফান্ড কাণ্ড

চিটফান্ড কান্ডের স্বরূপ সন্ধান

রূপম চ্যাটার্জী

ভুঁইফোঁড় অর্থলগ্নি সংস্থা নিয়ে রাজ্য তোলপাড়। একই ঘটনা ঘটেছে প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা এবং ওড়িশাতেও। তবে সব থেকে বেশি মানুষ প্রতাড়িত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। ঘটনার পরে বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরাতে রাজ্য সরকারের তৈরি শ্যামল সেন কমিশনে ইতিমধ্যে বাইশ লক্ষ আমানতকারীর আবেদন জমা পড়েছে। কিন্তু শুনানি হয়েছে মাত্র নশো জনের। ফলে ঠিক কীভাবে টাকা ফেরত দেবে তার জন্য ফর্মুলা বের করতেই কমিশন হিমশিম খাচ্ছে। সরকার যে তহবিল করেছে তা পাঁচশো কোটি টাকার। অথচ এখন পর্যন্ত যে হিসেব পাওয়া গেছে তা থেকে জানা গেছে যে সারদা কাণ্ডের নায়ক সুদীপ্ত সেন একাই বাজার থেকে ত্রিশ হাজার কোটি টাকার বেশি তুলেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যে অবৈধ অর্থলগ্নি সংস্থার যে তালিকা পাঠিয়েছে তাতে ৬৯টি সংস্থার নাম আছে। তার মধ্যে ২৯টি সংস্থার সংগৃহীত আমানত প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা। গত কুড়ি বছর ধরে এই ভুঁইফোড় সংস্থাগুলি তাদের লুঠতরাজ চালিয়েছে। ৫, ৭, ১০ বছর মেয়াদে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছে। যে সংস্থা ইতিমধ্যে কিছু টাকা ফেরত দিয়েছে তারা খুব সহজেই নতুন আমানতকারীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে। এই সংস্থাগুলি একই পন্থায় বাজার থেকে টাকা তোলেনি। বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছে।

সারদা গোষ্ঠী গত বছরের গোড়ায় একটি ব্যয়বহুল সুদৃশ্য বই প্রকাশ করেছিল। শুধুমাত্র সারদা গ্রুপের কর্মীদের জন্য। তাতে ১৮টি ব্যবসায়িক প্রকল্পের উল্লেখ আছে। এছাড়া ঐ বইতে ছবি দিয়ে সারদার টিম লিডারদের পরিচিতি দেওয়া হয়েছিল। তার প্রথম নামটি ছিল অবশ্যই কুণাল ঘোষের। এই টিম লিডারদের অধিকাংশেরই আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমের সংগে যুক্ত ছিল। তখনই সারদা রিয়েলটির সঙ্গে যুক্ত একজনের মন্তব্য ছিল— "এই বইটি শহুরে শিক্ষিতদের দেখালে সারদার উপর তাদের আস্থা বাড়বে।" এভাবেই আস্থা বাড়াবার নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল ভুঁইফোঁড় অর্থলগ্নি সংস্থাগুলি। সারদা গ্রুপ আবাসন, হোটেল, রিসর্ট, স্কুল, বায়োগ্যাস, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ এবং সংবাদমাধ্যমের ব্যবসার গল্প ফেঁদে আমানত সংগ্রহ করেছিল। গ্রামগঞ্জের পাশাপাশি হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, বারাসাত, মালদা, বহরমপুর সহ নানা ছোট বড় শহরে হাজার হাজার বেকার যুবকদের নামানো হয়েছিল ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমিশনের বিনিময়ে। কোন মানুষকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ৫০০০ টাকা জমা করাতে পারলেই নিজের ১০০০ টাকা রোজগার। আর মানুষের সামনে সারদার ভাবমূর্তি তুলে ধরা হতো সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে। অথচ এই বহু বিজ্ঞাপিত প্রকল্পগুলির অধিকাংশই ভুয়ো। এ প্রসঙ্গে জানাবো, ২০০৯ সালের গোড়ায় এক সকালে কলকাতার সমস্ত বড় কাগজে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন বেড়িয়েছিল সারদার নতুন ব্যবসার। চাল আটা সুজির ব্যবসা। সেই বিজ্ঞাপন দেখে গৌহাটির এক ব্যবসায়ী সরাসরি হাজির হলেন সল্টলেকের সারদার অফিসে। চা কফি খাইয়ে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে তাকে বলা হয়, "এখন ঐ মালপত্র বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে না।" এর বছর খানেক পর সারদা গোষ্ঠী এ জাতীয় কিছু নিম্নমানের পণ্য বাজারে ছেড়েছিল। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই আসাম ও এরাজ্যে সারদা এই অদৃশ্য ব্যবসার বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের কাছে সারদার মহিমা জাহির করে আমানতকারীদের ঠকানো শুরু করেছিল। দুভাবে এই বিজ্ঞাপনগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছে। এক, বিজ্ঞাপিত প্রকল্পগুলি দেখিয়ে সারদার এজেন্টরা মানুষদের বুঝিয়েছে সারদার ব্যবসা ও প্রতিপত্তির কথা। যা মানুষের মনে বাড়তি ভরসা জুগিয়েছে, এবং বেশি টাকা পাওয়ার লোভে যথা সর্বস্ব সারদার ঘরে জমা দিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। দুই, হোটেল-রিসর্ট-আবাসন-শপিংমল— বিজ্ঞাপনে এই প্রকল্পগুলি দেখিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই চিটফান্ড কোম্পানিগুলি (চলতি কথায়, যদিও এরা কেউ ১৯৮০ সালের চিটফান্ড আইনে রেজিস্ট্রিকৃত নয়) অর্থলগ্নি সংস্থা হিসাবে পরিচয় বহন করত না। এদের বাহারি সব নাম ছিল। সারদা গার্ডেন রিসর্ট এন্ড হোটেল প্রাঃ লিমিটেড, সারদা ল্যান্ডমার্ক সিমেন্ট প্রাঃ লিঃ, সারদা এ্যাগ্রো ডেভলপমেন্ট লিঃ, সারদা এডুকেশন এন্টারপ্রাইজ লিঃ, গ্লোবাল অটোমোবাইলস লিঃ, সারদা টুরস এন্ড ট্রাভেলস প্রাঃ লিঃ। শ্যামল সেন কমিশনের কাছে যেসব আবেদনপত্র জমা পড়েছে তাদের অধিকাংশই সারদা রিয়ালিটির ও সারদা টুরস এন্ড ট্রাভেলস-এর। সুদীপ্ত সেন মোট ১০৭টি কোম্পানি খুলেছিলেন, টাকা অন্যত্র সরাবার জন্য।

আমানতকারীদের এভাবেই সুমঙ্গল গ্রুপ আলুর বন্ড বিক্রি করেছে দ্বিগুণ লাভের লোভ দেখিয়ে। আবার তৈমুর আলি গায়েন তার এটিএম গ্রুপের ব্রোসিয়ারে মিনারেল ওয়াটার, পোলট্রি পার্ম, আবাসন, ভ্রমণ, এমন বহু আইএসও ৯০০১ঃ২০০৮ স্বীকৃত কোম্পানির সিএমডি বলে প্রচার করে শুধু হাওড়া হুগলী মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম শিলিগুড়ি রায়গঞ্জ থেকে

১০ কোটি টাকা তুলেছে। এবং সেই টাকা দিয়ে তৈমুর আলি তার স্ত্রী, বাবা, ভাই ও শ্যালকের নামে শত শত বিঘা জমি কিনেছে। শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ এই তৈমুর আলি। তার প্রচারপুস্তিকা ও অফিস ঘরে মমতা ব্যানার্জীর সংগে ফুলের তোড়া বিনিময়ের একটি প্রমাণ সাইজের ছবি ছিল এটিএম গ্রুপের টাকা তোলার অন্যতম হাতিয়ার। ভিভা ট্রাভেলস লোকের কাছ থেকে মাসিক কিস্তিতে টাকা জমা নিত। বলা হতো, কয়েক বছর টাকা জমানোর পর সেই টাকায় দিল্লী, মুম্বাই, কাশ্মীর বেড়াতে নিয়ে যাবে। অথবা সুদ সহ টাকা ফেরত। আজ পর্যন্ত কেউ বেড়াতে যাননি, কারণ তার জন্য ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে ভিভা এন্টারটেইনমেন্ট-এর ব্যানারে ভিভা-র মালিক সামিম আখতার প্রায় ২ কোটি টাকা দিয়ে তৈরি করে ফেলেছেন একটি ছবি। ছবিটি ফ্লপ, কিন্তু তাতে কী? ভিভা স্টাডিজ, ভিভা ফুড প্রডাক্ট, ভিভা এন্টারটেইনমেন্ট-এর নানা বিজ্ঞাপনের দৌলতে কয়েক কোটি টাকা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তুলে ফেলেছেন আখতার সাহেব।

টাকা তোলার সুবিধার জন্য বিভিন্ন চিট ফান্ড সংস্থা নিজস্ব টিভি চ্যানেল বা নিদেনপক্ষে একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করার পথ ধরলেন। এতে এক ঢিলে দুই পাখী মারার কৌশল ছিল। এজেন্টরা বুক ফুলিয়ে বলত, "আমাদের নিজস্ব সংবাদপত্র, চ্যানেল ইত্যাদি আছে"। অন্যদিকে সেই সংবাদপত্র ও চ্যানেল দিদির সরকার তথা সংসারের প্রতি পরম আনুগত্য দেখিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষা পাচ্ছিল। এভাবেই বাজারে এলো সারদা গোষ্ঠীর প্রায় ৬টি চ্যানেল ও ৫টি সংবাদপত্র, রোজ ভ্যালির খান কয়েক চ্যানেল ও একটি দৈনিক, এলো প্রয়াগ, প্রাত্যহিক সংবাদ, ভোরের বার্তা, নিউজ বাংলা, দিন পরিবর্তন, আবার যুগান্তর ইত্যাদি।

চিটফান্ড নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম যখন স্বাভাবিক নিয়মে এই লুঠের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তখন আনন্দবাজার থেকে গণশক্তি মোটা টাকায় বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে এই লুঠের পরোক্ষ কিন্তু নির্ভরযোগ্য সহায়কের ভূমিকা পালন করে গেছে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের বাম-ডান সকলেরই 'উজ্জ্বল' ভূমিকাকে ছোট করে দেখলে সত্যের অপলাপ হবে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসুরা "সামাজিক অনুষ্ঠানের" অজুহাতে চিটফান্ড সংস্থা মালিকদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আর তৃণমূলের নেতারা কেন, গোটা সরকারটাই চিটফান্ড মালিকদের কব্জায়। দলের মধ্যে বহু নেতা এখন কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে ঘৃণা-ভরা উক্তি করছেন। তবে তাঁরা জানেন, মমতার পক্ষে কুণালকে ত্যাগ করা অসম্ভব। সিবিআই তদন্ত আটকাতে রাজ্য সরকার মরিয়া। শুধু তাই নয়, বিধাননগর কমিসারিয়েট ফেমা, এসএফআইও-এর মত কেন্দ্রীয় সংস্থার জেরা থেকে সুদীপ্ত, দেবযানী, কুণালদের বাঁচাতে লজ্জাজনকভাবে তৎপর। সুদীপ্ত সেন মমতার আঁকা ছবি কিনে, জঙ্গলমহলের জন্য অ্যাম্বুলেন্স দান করে, তৃণমূলের সেবায় সংবাদপত্র থেকে টিভি চ্যানেল উৎসর্গ করার বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা জনসাধারণের থেকে লুঠ করেছে। কুণাল ঘোষই সুদীপ্তকে সংবাদমাধ্যমের ব্যবসায় নামিয়ে তার ভরাডুবি ত্বরান্বিত করেছে। অন্যদিকে কুণাল তার নিজের রোজগার বাড়িয়ে পূর্বাঞ্চলে সিইও হিসাবে দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিয়েছিল। (আইটিসি-র ওয়াই সি দেবেশ্বরের পরেই) একই সঙ্গে একগুচ্ছ তৃণমূল নেতাকে সারদার থেকে টাকা আদায়ের সহজ পথ করে দিয়েছিল। যে কারণে কুণালকে আড়াল করতে মমতা এত মরিয়া। তবে একথাও ঠিক, বামফ্রন্ট জমানার প্রথম দিকে অশোক মিত্র সঞ্চয়িতা, ওভারল্যান্ড ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সে জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কোন তাগিদ অসীম দাশগুপ্তর ছিল না। ভোটের আগে গৌতম দেব যে হম্বিতম্বি করেছিলেন, ভোটে হারার দুঃখে তার সব ক্ষোভ উবে যায়। তবে ভোট-সর্বস্ব একটি দলের কাছে অন্য কিছু আশা করা ঠিক নয়। তা ছাড়া যে সিপিএম-এর ছত্রছায়ায় অনলাইন লটারির রমরমা চলেছে, যারা শ্রমিক বস্তি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ পাড়ায় অন লাইন লটারির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাদের পক্ষে চিটফান্ডের কার্যকর বিরোধিতা আশা করা ভুল। আর এই নৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই দেখা যাচ্ছে, সিপিএম দলেরও নানাভাবে নানাস্তরের কর্মী ও নেতারা চিটফান্ড সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে।

তবে হ্যাঁ, রোজ এক কোটি টাকার অনলাইন ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকতা করার সুনিপুণ কৌশল সিপিআইএম দলের জানা আছে। তৃণমূলের সেই পেশাদারিত্ব নেই। এখন মমতা ব্যানার্জী টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি ও বিশেষ তদন্ত দল (SIT), কমিশনও আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষায় আইন তৈরির দীর্ঘমেয়াদি খেলায় নিজের পাপ আড়ালের চেষ্টা চালাচ্ছেন। চিটফান্ড মালিকদের সম্পত্তি উদ্ধার করে বেচে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেবার দিন করে আসবে, আর দশ লক্ষ মানুষের মধ্যে কজন তা ফেরত পাবেন তা অনিশ্চিত। ৫০০ কোটি টাকার তহবিলের সংস্থান বাস্তবে কতটা হয়েছে তা অর্থদপ্তরের কর্তারাও বলতে চাইছেন না। টাকা পেলেও ৫০০ কোটিতে কজনকে দেবে আর কীসের ভিত্তিতে দেবে তা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। বহু মানুষের কাছে বৈধ কাগজপত্র নেই। কাগজ হয় হারিয়েছে, অথবা সুদীপ্ত সেনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী জাল রসিদ দেওয়া হয়েছে। সুদীপ্ত সেন নিজেই বলেছে, সারদা সংস্থার বারুইপুরের ডিভিশনাল ম্যানেজার অরিন্দম দাস ওরফে বুম্বা শাসকদলের মদতে বারুইপুর অফিসে

আধিপত্য কায়েম করে আমানতের কোটি কোটি টাকা এবং জমি হাতিয়ে নিয়েছে। পুলিশের একাংশ বলছে, চোরের ওপর যারা বাটপারি করেছে তাদের কাছ থেকে টাকা ও সম্পত্তি উদ্ধার করা কঠিন। তাই আমানতকারীদের টাকা ফেরত এখনও অনিশ্চিত।

অন্যদিকে, সারদা কাণ্ডের জেরে রাজ্য সরকার নতুন আইন তৈরির উদ্দেশ্যে যে বিল তৈরি করেছে তার তিনটি বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিলটি ফেরত পাঠিয়েছে। ঐ আইন ছাড়া নাকি চিটফান্ড কাণ্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে টাকা উদ্ধার সম্ভব নয়। তা যদি হয়, একথাও উঠছে যে পুরনো ফৌজদারি অপরাধের বিচার নতুন আইন দিয়ে করা যায় না। সংবিধানের ২০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, অপরাধের সময় যে আইন চালু থাকবে সেই আইনেই অপরাধীর শাস্তি হবে। দিল্লী গণধর্ষণের পর কড়া আইন তৈরি হলেও অপরাধীদের বিচার হচ্ছে পুরনো আইনে। সেক্ষেত্রে মমতার নতুন আইন যদি সুদীপ্ত সহ অন্য চিটফান্ড কাণ্ডের অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা না যায় তাহলে শাস্তি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে টাকা উদ্ধার কতটা সম্ভব হবে সে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে। আসলে আবার সবটাই একই চিত্রনাট্যের অংশ কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধছে।

শাস্তিদানের বাইরে আর একটি বিষয় ছিল, কেন সাধারণ মানুষ এই চিটফান্ডের প্রতারকদের পাল্লায় পড়ল? শুধুই কি লোভ, না আসলে ডাকঘরে স্বল্পসঞ্চয়ে সুদ কমিয়ে দেওয়া এবং ব্যাংকগুলির দৈনিক জমা প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ায় মানুষ বিকল্প হিসাবে চিটফান্ডের ফাঁদে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া, বহু গ্রামেই ব্যাংক পরিষেবা নেই, আর যেখানে আছে সেখানে নিয়মের জটিলতার জন্য সাধারণ দিন-আনি-দিন-খাই মানুষ যেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। ব্যাংকের তরফেও এদের গ্রাহক করার জন্য কোনো উৎসাহ নেই। সম্প্রতি চালু হওয়া ব্যাংকিং করেসপন্ডেন্ট এখনো রাজ্যের ৩০০০০ গ্রামের গুটি কয়েকটিতে মাত্র যেতে শুরু করেছে। ফলে মানুষ বিভ্রান্ত, অসহায়। যার সুযোগ নিয়েছে চিটফান্ড সংস্থাগুলি। এ রাজ্যে ২০টিরও বেশি সংস্থা দৈনিক জমা প্রকল্পে১০/২০/৫০ টাকা জমা নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা এখনও তুলে চলেছে, প্রান্তিক আয়ের মানুষদের কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, গোটা দেশ জুড়েই চিটফান্ডগুলি মানুষকে প্রতারণা করছে। বহু-পরিচিত সাহারা কোম্পানি ২৪,০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। রিজার্ভ ব্যাংক, *সেবি* বা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এই লুঠে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

সব চেয়ে মজার কথা, বহু ভুঁইফোঁড় কোম্পানি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ও রিজার্ভ ব্যাংকের ছাড়পত্র দেখিয়েই টাকা তুলেছে। সন্মার্গ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, আমাজন ক্যাপিটাল, রোজ ভ্যালি রিসর্ট অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন, বোটানিস্ট বায়োটেক প্রজেক্ট, রেনবো-গ্রিন ফিল্ড, সোনালি এগ্রো, শ্রী এগ্রো-র মতো একাধিক সংস্থা যে ব্যবসায়িক ঘোষণা করে ছাড়পত্র পেয়েছিল, কার্যক্ষেত্র সেই ঘোষণা অনুযায়ী না চলে অবৈধভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলেছে। আরবিআই থেকে *সেবি*, সবারই কাঁচা ঘুম ভেঙেছে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার পর। এখন যাদের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে, তাদের অনেকেই অফিস গুটিয়ে পালিয়েছে। সাহারা কোম্পানি যেভাবে রাষ্ট্রীয় 'সাহারায়' দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করেছে তা অনেক চিটফান্ড মালিককেই অনুপ্রাণিত করেছে। সুপ্রিম কোর্ট বাধা হয়ে না দাঁড়ালে কেউ তা টের পেত না। পশ্চিমবঙ্গ সহ অধিকাংশ রাজ্যে শাসকদলকে কব্জায় রেখে সাহারার পথকেই অনুসরণ করেছে চিটফান্ড-ওয়ালারা।

আকর বুকস, কর্নারস্টোন পাবলিকেশনস্,
আপডেট পাবলিকেশনস্,
মান্থলি রিভিউ প্রেস,
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পিবিএস, সেতু প্রকাশনী সহ নানা প্রকাশনার মননশীল ও র‍্যাডিক্যাল বইয়ের জন্য
আসুন

গ্রন্থমেলা

এ (পি) ১২, বর্ণপরিচয় (পুরোনো কলেজ স্ট্রিট মার্কেট)
কলকাতা ৭, দোতলায়

চিটফান্ড কাণ্ড

চিটফান্ড : অনিয়ন্ত্রিত লুঠ

সুদীপ্ত সাহা রায়

সারদা কোম্পানির ভরাডুবির পর টেলিভিশনের পর্দায় বিজ্ঞাপন মারফত বেশ কিছু সংস্থার কর্ণধারদের তাদের কর্মপদ্ধতির সাফাই গাইতে দেখা গেল। তারা জানালেন, তারা সারদার মত নন। তাদের কোম্পানির ভিত্তি হলো অ্যাসেট অর্থাৎ সম্পদ। অর্থাৎ বোঝাতে চাইলেন যে ফাটকা নয়, পণ্য অর্থনীতি অর্থাৎ উৎপাদনশীল অর্থনীতিতে তাদের একটি ভূমিকা আছে। কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের অর্থ তারা ম্যানুফ্যাকচারিং, রিয়েল এস্টেট, নির্মাণ, রপ্তানি-বাণিজ্য, পরিবহন, বিপণন, পর্যটন, হোটেল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ইত্যাদি পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেন। পন্‌জি প্রকল্পের মতো তারা মাছের তেলে মাছ ভাজছেন না। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, পন্‌জি প্রকল্পে সংগৃহীত বিনিয়োগকৃত অর্থ অর্থনীতির কোন উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নি; ফলে তার কোন উদ্বৃত্ত তৈরি করার কারণ নেই। হাজার হাজার আমানতকারীর স্বার্থের বিনিময়ে মুষ্টিমেয়র পকেট ভারী করে পন্‌জি প্রকল্প; অতএব, এই প্রকল্প কার্যত পুঁজির আদিমতম সঞ্চয়ের একটি পরিশীলিত রূপ।

প্রসঙ্গত, এই কর্তাব্যক্তিরা তাদের তথাকথিত সম্পদ বা অ্যাসেট দেখিয়ে আমানতকারীদের যথাসময়ে প্রাপ্য ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে যতই আশ্বস্ত করুক না কেন, গত ১৪ মার্চ, ২০১৩ তারিখে সারদা-সাম্রাজ্য ধসে যাওয়ার দিন কয়েক আগে কেন্দ্রীয় কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শচীন পাইলট যে ৭৩টি কোম্পানির নাম সম্বলিত তালিকা লোকসভায় পেশ করেছেন, সেই তালিকায় এইসব সাফাই-গাওয়া কর্তাব্যক্তিদের সংস্থাগুলির নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। এরা বেআইনি পন্‌জি বা বহুস্তরীয় বিপণন (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং) প্রকল্প চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। সেবি-র প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরকারের তরফ থেকে লোকসভাকে তা অবগত করেছেন। এই কোম্পানিগুলো সম্পর্কে বিশদ খোঁজ নিতে রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ আসে তখনই।

প্রকৃতপক্ষে কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের নামে চলছে ভুঁইফোঁড় সংস্থাগুলির যথেচ্ছ লুঠপাট। সারদা কোম্পানি এই সেদিন পর্যন্তও এই প্রকল্পের নামে বহু আমানতকারীকে বিপথে চালিত করেছে। সারদার পতনের পরে বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফত অনেক মানুষই জানতে পারলেন যে এশিয়ান ভেজপ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, কিয়েত ফিনান্স লিমিটেড, ওরিয়েন্টাল রেমিডিজ এ্যান্ড হারবাল লিমিটেড, এসএসকে ফিস্‌কাল সার্ভিসেস লিমিটেড, সাকেত এক্সট্রুশনস লিমিটেডের মত অন্তত ১৪টি সংস্থা কুখ্যাত পন্‌জি প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষকে প্রতারণা করে উধাও হয়ে গিয়েছে। উঠে এসেছে এই তথ্যও যে, সেবি ২০১১ সালেই নাকি সারদা রিয়েলটি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং আরও কয়েকটি সংস্থার বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছিল। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে এদের সম্পর্কে সতর্কবাণী ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে উচ্চারিত হচ্ছে অনেকদিন ধরেই। অনেকের মনে পড়বে, গত বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ইউনাইটেড ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটিও (এসএলবিসি) এই কোম্পানিগুলোর দৌরাত্ম্যে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি গ্রাম বাংলার আর্থিক জীবনে তৈরি হয়েছে তার উল্লেখ করেছিল একাধিকবার। পাঠক স্মরণ করুন, এ বিষয়ে খোদ রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের সতর্কবার্তাও। গত বছর ডিসেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় বোর্ডের সভা উপলক্ষে ডঃ ডি সুব্বারাও কলকাতায় এলে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেছিলেন রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। সাক্ষাতের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তাতে এই রাজ্যে বেআইনি চিট ফান্ডের রমরমা এবং বহুস্তরীয় বিপণন (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং)-এর নামে তারা যে বিপর্যয় রাজ্যবাসীর আর্থিক জীবনে নামিয়ে আনছে তা স্পষ্ট আন্দাজ করা গিয়েছিল।

কার্যত এই বহুস্তরীয় বিপণন কোম্পানিগুলির টার্গেট হলো মূলত গ্রামের অশিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত গরিব নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ। কারণ এরা সহজেই প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়েন। এরা কম খেয়ে, কম পড়ে, খুব কষ্টে যৎসামান্য সঞ্চয় করেন। আগে ডাকঘরে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সেই অর্থ তারা জমাতেন। কিন্তু একদিকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সুদের হার অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দেওয়া, অন্যদিকে উদারীকরণের বাতাবরণে সম্পৃক্ত পরিমণ্ডলে নেতা-মন্ত্রী-আমলা-পুলিশকর্তা-শিল্পী-অভিনেতা-অভিনেত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় ভুঁইফোঁড় আর্থিক সংস্থাগুলির আগ্রাসী অভিযানে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর আন্দোলন ও কার্যধারা আক্রান্ত। ভয়াবহ আর্থিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রায়ত্ত ও গ্রামীণ ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী সমন্বয় করে গ্রামীণ গরিব মহিলাদের বেশ খানিকটা স্বাবলম্বী করার যে কার্যকর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা উল্টোপথে হাঁটতে শুরু করল। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা গ্রামে বেশ ভাল সংখ্যায় এই বেআইনি চিট ফান্ডগুলোর খপ্পরে পড়লেন। তারা তাদের কষ্টার্জিত উদ্বৃত্ত আর গোষ্ঠীতে জমা না দিয়ে ঐ ভুঁইফোঁড় বেআইনি কোম্পানিগুলির নানান লোক ঠকানো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে শুরু করলেন। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। সারদাকাণ্ডের পর এখন পর্যন্ত ২৩

জন আত্মঘাতী হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন সংস্থা-মালিক, বাকিরা আমানতকারী ও এজেন্ট।

এখন, এই বহুস্তরীয় বিপণন ক্ষুদ্র আমানতকে ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে টেনে আনতে বিপণনের প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন এজেন্ট (বিক্রেতার) সংখ্যা ক্রমশ বাড়াতে থাকে। তাদের উপর দায়িত্ব চাপায়। ন্যস্ত দায়িত্বপালনের বিনিময়ে এজেন্টদের আকর্ষণীয় পুরস্কার ও কমিশন প্রাপ্তির লোভ দেখানো হয়। এই হলো রেফারেল মার্কেটিং-এর সূত্র। এই রাজ্যে এই কোম্পানিগুলি এই বেআইনি বহুস্তরীয় বিপণনে মূলত অস্ত্র করেছে কৃষিজাত দ্রব্য ও রিয়েল এস্টেটকে। এই কোম্পানিগুলি বন্ড, ডিবেঞ্চার, এমন কি যৌথ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের মধ্যে যে দায় সীমাবদ্ধ থাকে তার ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের তাদের ঘোষিত রিয়েল এস্টেট প্রকল্পগুলিতে অংশীদার হতে আহ্বান জানায়। এটাকে লিমিটেড লায়াবিলিটি প্রকল্প বলে। বিনিয়োগকারীদের ২০-৫০ শতাংশ রিটার্নের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। শেয়ার বাজার যেহেতু অনিশ্চিত, তা ওঠা-নামার নিয়মে চলে, সেহেতু নিশ্চিত রিটার্ন, Assured Return-এর ঘোষণা অবশ্যই আইনসম্মত নয়। এবং এটাই ধাপ্পাবাজির কৌশল। দু-তিন বছরের মেয়াদে বিনিয়োগকারীরা সমস্ত ফেরতের আশ্বাসও পান। এই বন্ড, ডিবেঞ্চার, লিমিটেড লায়াবিলিটি স্কিম প্রভৃতিকে গুচ্ছায়িত করে যে স্কিম তৈরি করা হয় তার নাম দেওয়া হয় কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম যা একটি Financial Instrument বা আর্থিক দলিল। ১৯৯০ সালে *সেবি* এই কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিমকে আইনসিদ্ধ করে। গত শতাব্দীর ৯০-এর দশকে বেশ কিছু কোম্পানি শেয়ার বাজারে লেনদেনে যুক্ত হয়ে বিনিয়োগকারীদের দিয়ে কৃষি বা বাগিচা শিল্পে বিনিয়োগ করছিল এই কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের মাধ্যমে অত্যন্ত চড়া রিটার্নের লোভ দেখিয়ে। তখন থেকে সেবি এই কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিমকে নজরদারির আওতায় নিয়ে আসে।

এই কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম কোন কোম্পানিকে চালাতে গেলে তাকে সেবির আইন অনুযায়ী কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধীকৃত হতে হয়, অর্থাৎ কোম্পানি আইন ১৯৫৬ বলে কোম্পানি নিবন্ধকের কাছে নিবন্ধীকৃত হওয়ার পর *সেবি*-র কাছে কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হিসেবেই নিবন্ধীকৃত হতে হবে, অন্য হিসেবে নয়। অন্য হিসেবে রেজিস্ট্রেশন নিলেও সেই কোম্পানি আইনত কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম চালাতে পারবে না। কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম চালাতে গেলে তার *সেবি*-র রেজিস্ট্রেশন থাকলেও তাকে কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হিসেবে আবার নতুন করে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য আলাদা রেজিস্ট্রেশন *সেবি* থেকে নিতে হবে। অর্থাৎ কোম্পানি বর্তমানে যে প্রকল্প চালাচ্ছে তার রেজিস্ট্রেশন আছে বলেই নতুন প্রকল্পের আর রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই, তা কিন্তু নয়।

আমাদের রাজ্যে আলুর বন্ড এই ধরনের কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্টের ইনস্ট্রুমেন্ট, যার সঙ্গে যুক্ত আছে কালো তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোও। এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে যে ১৫ মাসে ২০-২৫ শতাংশ হারে নিশ্চিত রিটার্নের প্রস্তাবে বন্ড বিক্রয়কারী সুমঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিসের আলুর বন্ড বিক্রির উপর *সেবি* নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই সমস্ত খবরই এখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত। *সেবি*-র সুনির্দিষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকেই কোন কোন কোম্পানি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে কৃষিজ পণ্য ও বীজ রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে বাজারে বন্ড ছেড়েছিল ৪০ শতাংশ নিশ্চিত লাভের লোভ দেখিয়ে এবং তা স্বল্প মেয়াদান্তে। এই কোম্পানিগুলি বেআইনি পথে, ন্যায্য অনুমতির তোয়াক্কা না করে কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম চালিয়ে বিনিয়োগকারীর ঝুঁকিটা বাড়ায় কীভাবে? কোম্পানির মোট সম্পদ ও মোট দামের মধ্যে তৈরি হয় বড় ধরনের গরমিল। অ্যাসেট-লায়াবিলিটি মিস্ম্যাচ। এটা বাড়তেই থাকে। কারণ এই প্রকল্পে বিনিয়োগকারীর অর্থ রিয়েল এস্টেট বা মিডিয়া বা বিনোদন শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়, যার থেকে অর্থের মুখ দেখতে হলে স্বভাবতই বেশ দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। চট্জলদি লাভ এই ক্ষেত্র থেকে হয় না। উৎপাদনের এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের অন্তর্বর্তী সময়কালটি অর্থাৎ Gestation Period সুদীর্ঘ হয়। তাই বিনিয়োগকারীর প্রাপ্য অর্থ ফেরতের কাজটা কোম্পানি নতুন বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকেই করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কোম্পানির মাথায় ঝুলতে থাকে ক্রমবর্ধমান স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণ ফেরতের খড়্গ। এর ফলেই এই প্রকল্প প্রাথমিকভাবে পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদনের সাথে খানিকটা যুক্ত থাকলেও তা ক্রমশ ফাটকাবাজির চরিত্র অর্জন করে। ঋণ পরিশোধের জন্যই ঋণ— এই দুষ্টচক্র বিনিয়োগকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। উপরন্তু, *সেবি*-র সুনির্দিষ্ট অনুমোদন ছাড়াই এই প্রকল্প কোম্পানি চালাতে থাকে বলে তারা মনে করে যে প্রকল্পের জন্য *সেবি*-র যখন প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন নেই তখন *সেবি*-রও নজরদারির দায় নেই, মাথাব্যথা নেই। অতএব এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগকারীদের অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নিতে কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা কসুর করে না, কোম্পানির লাভের বিনিময়ে কর্তাব্যক্তিরা ব্যক্তিগত লোভের নেশায় মত্ত হয় ওঠে। তখন কোম্পানির সম্পদের মূল্য তলানিতে এসে ঠেকে মোট দামের তুলনায়।

তাহলে এতবড় মাপের আর্থিক কেলেংকারি, অতীতে যা এই রাজ্যে কেন সারা দেশে হয়েছে কিনা সন্দেহ, তা থেকে আমরা কি আদৌ কোন শিক্ষা নেব? কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংক, *সেবি* প্রভৃতি নিয়ামক সংস্থা কি এগিয়ে আসবে সাধারণ মানুষকে নিঃস্ব-রিক্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে। নাকি নিয়ন্ত্রণহীনতা, নজরদারিহীনতা ও তদারকিহীনতাই হলো উদারীকরণের অনিবার্য পরিণাম। এই আলোচনায় সংশ্লিষ্ট মহলকে টেনে আনতে হবে। রাজনৈতিক স্তরে যত অসম্ভবই হোক না কেন, এক শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণকারী ও নজরদারি ব্যবস্থার

জন্য অতি দ্রুত ঐকমত্য গড়ে তোলা দরকার। আর্থিক বাজারে বহুমুখী ও বিচিত্র ধরনের কর্মপদ্ধতি প্রতিদিন হাজির হচ্ছে। উদারিকৃত অর্থনীতিতে তার মাত্রা বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে আইনি জটিলতাও থাকবে। নিয়ামক সংস্থার ভিতরে থাকতে হবে দায়িত্ব ভাগাভাগি এবং সুসমন্বিত দায়িত্ব উভয়ই। নিয়ামক সংস্থাগুলিকে যারা ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখতে চায় তাদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ করেই এগিয়ে যেতে হবে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণকে। সচেতন সংবেদনশীল সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলি সারদা কাণ্ডে নিঃস্ব-রিক্ত মানুষদের নিয়ে গোটা দেশবাসীর কাছে একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক ও নজরদারীর কথা তুলে ধরুক। সারা দেশে অন্তত ৪২০০টি রেজিস্ট্রিকৃত চিট ফান্ডের অস্তিত্ব আছে। তার মধ্যে এই রাজ্যে মাত্র একটি। কেন নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির স্তরে বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারের মধ্যে সুসমন্বয় দরকার। ধরুন এই চিটফান্ড— এরা কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রকের অধীনস্থ কোম্পানি নিবন্ধকের কাছ নিবন্ধীকৃত হয়ে বিভিন্ন রাজ্যের রেজিস্ট্রার অব চিট্স্-এর কাছে নিবন্ধকরণ করাবে কেন্দ্রীয় আইনে তৈরি হওয়া চিট ফান্ডের উপর নজরদারি করবে রাজ্য সরকার, ‘‘মানি ব্যানিং সার্কুলেশন আইন’’-এর সাহায্যে। মজার কথা হলো, রিজার্ভ ব্যাংক আইনে এই চিট ফান্ডকে মিসসেলানিয়াস নন্ ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি বলা হয়েছে। যদিও এর নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারিতে রিজার্ভ ব্যাংকের কোন ভূমিকা রাখা হয়নি। চিট ফান্ড সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারে না, এই কাজে তার কোন অধিকার নেই, চিট ফান্ড কেবল তার সদস্যদের নিয়ে তৈরি হয়। সদস্যরা নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তহবিলে চাঁদা দেন। সদস্যরা শেয়ার হোল্ডার। তাই চিট ফান্ড শেয়ার হোল্ডারের কাছে শেয়ার বিক্রি করে সেই বাবদ টাকা তুলতে পারে। এদিকে বেআইনি চিট ফান্ডগুলো, বেআইনি বলছি কেন? কারণ তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি নিবন্ধকের কাছে নিবন্ধীকরণের পরে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রেজিস্ট্রার অব চিট্সের কাছে নিবন্ধীকরণ করায় নি, তারা আমানতকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আমানতকারীদের শেয়ার-হোল্ডার হিসেবে দেখায়, কিন্তু শেয়ার-হোল্ডার হিসেবে দেখালে এবং তার সংখ্যা যদি ৫০-এর বেশি হয় তাহলে *সেবি*-র অনুমোদন নিতে হবে, কিন্তু তার *সেবি*-র অনুমোদন নেই অর্থাৎ বেআইনি চিট ফান্ডের লেবেল যাতে না সেঁটে যায় সেই চেষ্টা করতে গিয়ে তাকে *সেবি*-র আইন ভাঙতে হয়।

অন্যদিকে, সারাদেশে ১২৩৭৫টি নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি নিবন্ধকের কাছে নিবন্ধীকরণের পর এরা রিজার্ভ ব্যাংকে এনবিএফসি হিসেবে নিবন্ধীকৃত। এর মধ্যে ৫৭৯৯টি রিজার্ভ ব্যাংকের কলকাতা কার্যালয়ের অধীনে। এনবিএফসি-র নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারিতে আছে রিজার্ভ ব্যাংক। যদিও এই ১২৩৭৫টি মধ্যে মাত্র দুশোর বেশি প্রতিষ্ঠানের জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের অনুমোদন দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক, যার মধ্যে এই রাজ্যে এই সংস্থা মাত্র ৪ (চার)। ব্যাংকের আমানতকারীদের রক্ষা করা এবং তাদের আমানত ফেরত নিশ্চিত করার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের। কিন্তু এনবিএফসি-র আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা, তার আমানত ফেরতের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি ল বোর্ডের। এনবিএফসি যখন বন্ড, ডিবেঞ্চার, কমার্শিয়াল পেপার মারফত বাজার থেকে অর্থ তুলবে তখন ঐ কাজ করতে সংশ্লিষ্ট এনবিএফসি-র *সেবি*-র প্রয়োজনীয় অনুমোদন থাকতে হবে এবং ঐ অংশের তদারকির দায়িত্বে থাকবে *সেবি*।

তাহলে বাজারে মোট ৫৪ হাজার কোম্পানি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে ৪২০০টি চিট ফান্ড, ১২৩৭৫টি নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি আছে কোন না কোন নিয়ন্ত্রণ বা নজরদারির কম-বেশি আওতায়। সেখানে দুর্বলতা থাকলে তা দূর করতে এগিয়ে আসতে হবে মূলত রিজার্ভ ব্যাংক ও *সেবি*-কে। কিন্তু বাকি ৩৭ হাজার কোম্পানি, তারা বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বেআইনি চিট ফান্ডের কারবার চালাচ্ছে। সুদীপ্ত সেনের ভয়ঙ্কর অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দরকার। আরও জরুরি, সুদীপ্ত সেনরা যেন কখনও আর্থিক ব্যবসায় মাথা তুলতে না পারে। তার জন্য মনে হয়, ঐ ৩৭ হাজার ‘স্বাধীন’ কোম্পানিগুলিকে এখনই রিজার্ভ ব্যাংকের নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধীকৃত করে জোরদার অর্থবহ নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির আওতায় আনা খুব জরুরি।

রেজিস্ট্রেশন অব কোম্পানিজ, রিজার্ভ ব্যাংক, *সেবি*, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সম্মিলিতভাবে সারা দেশে জেলা-স্তর পর্যন্ত এই ব্যাপারে কাজের পরিকাঠামো সুসমন্বয়ের মাধ্যমে গঠন করুক। চিট ফান্ড হিসেবে হোক, নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি হিসেবে হোক, কিংবা মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং কোম্পানি বা কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিই হোক— কেউই যেন আইনকে এড়িয়ে যেতে না পারে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানি আবেদনপত্রের উল্লেখ অনুযায়ী চিটফান্ড বা এনবিএফসি বা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানিরা কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, যে হিসেবেই পরিচিত হতে চায় সে হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার অব চিটস্, রিজার্ভ ব্যাংক বা *সেবি*-র সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমতি বা অনুমোদনের পরেই এদের নিবন্ধীকরণের চূড়ান্ত শংসাপত্র দিক কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি নিবন্ধক। তারপর নিয়ামক সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ ও ধারাবাহিক নজরদারির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করুক। এই কাজে রিজার্ভ ব্যাংক অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটু বাড়তি দায়িত্ব নিক। রিজার্ভ ব্যাংক তার প্রাতিষ্ঠানিক কুশলতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আরও ব্যবহার করুক। *সেবি*, রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুক। প্রয়োজন এক সুসমন্বিত সুদৃঢ় পদক্ষেপ, যার শীর্ষে থাকতে হবে রিজার্ভ ব্যাংককে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রককে নয়।

ওষুধ বিতর্ক

ওষুধের দাম, জেনেরিক নাম ও ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান

পুণ্যব্রত গুণ

গত মাস ছয়েক ধরে তর্ক-বিতর্ক চলছে সরকারি হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান নিয়ে। তৃণমূল সরকার স্বভাবতই এই পদক্ষেপকে জনমুখী প্রতিপন্ন করতে চাইছেন, বিরোধিতা করছে ওষুধের দোকানিদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বিসিডিএ, সরকারের যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করেছেন চিকিৎসকদের অনেকে...। জানুয়ারির ২১ তারিখে রাজ্যব্যাপী প্রায় ৩০,০০০ ওষুধের দোকান ধর্মঘট হয়ে গেল বিসিডিএ-র ডাকে। পাশাপাশি মাঝেমধ্যে দেখা দিচ্ছে মমতা-ঝড়—বিশেষত যাতায়াতের পথে এসএসকেএম-এ হানা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী-স্বাস্থ্যমন্ত্রী। দেখছেন নায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের অবস্থা, অন্য ওষুধের দোকানগুলো ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে কিছু ওষুধ কেনা রোগীদের বাকি ওষুধ বিক্রি করতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন, সরকারি ডাক্তাররা জেনেরিক নামেই যাতে কেবলমাত্র ওষুধ লেখেন তার জন্য সতর্ক করছেন। সতর্কীকরণ অগ্রাহ্য করায় শো-কজের চিঠি ধরানো হচ্ছে সরকারী ডাক্তারদের।

পত্র-পত্রিকায় বিষয়টার পক্ষে-বিপক্ষে লিখছেন চিকিৎসকরা, গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা। মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের একটি সংগঠন বিতর্কসভা আয়োজন করেছে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান নিয়ে। বিতর্কে ঢোকার আগে জনসাধারণের কাছে ওষুধের উপলব্ধতা কতটা, ওষুধের মূল্য কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হয় সে বিষয়গুলো বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রচুর ওষুধ, মানুষের জন্য ওষুধ নেই...

আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে একটা। ২০০৯-২০১০ সালে ৬২,০৫৫ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হয়েছে দেশের বাজারে আর ৪২,১৫২ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হয়েছে। উৎপাদিত ওষুধের আয়তনের হিসেবে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়, মোট দামের হিসেবে পৃথিবীতে ১৪ নম্বর। এই ফারাকের কারণ হল আমাদের দেশে ওষুধের দাম অনেক দেশের তুলনায় কম। তাই মোট আয়তন বেশি হলেও মোট দাম কম।

এত উৎপাদন সত্ত্বেও অবশ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক ওষুধ কিনতে পারেন না। চিকিৎসার মোট খরচের একটা বড় অংশ (৭০-৮০ শতাংশ) জুড়ে থাকে ওষুধের দাম। চিকিৎসার খরচ যোগাতে দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যায় অনেক রোগীর পরিবার।

ওষুধের মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে

স্বাধীনতার ৩২ বছর পর ১৯৭৯ সালে প্রথম ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারি ভূমিকা দেখা যায়। সব ওষুধগুলোকে বিন্যস্ত করা হয় চারটে শ্রেণীতে এবং লাভের সীমা স্থির করে দেওয়া হয়।

সারণি-১

শ্রেণী	*কী ধরনের ওষুধ*	*লাভের মাত্রা*
প্রথম	জীবনদায়ী	৪০%
দ্বিতীয়	জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক	৫৫%
তৃতীয়	অন্যান্য	১০০%
চতুর্থ	নতুন ও বাকি ওষুধ	লাভের কোনো উর্ধ্বসীমা নেই

ভাবা হয়েছিল এই শ্রেণী বিভাগের ফলে জনসাধারণ জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ কম দামে পাবেন। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ওষুধ উৎপাদনে কোম্পানিগুলোর যেটুকু কম লাভ হবে তা তারা পুষিয়ে নেবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ওষুধে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ওষুধ কোম্পানিগুলো জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরি কমিয়ে দিয়ে তৈরি করতে লাগল টনিক-কাশির সিরাপের মত অপ্রয়োজনীয় ওষুধ। যক্ষ্মা-কুষ্ঠের ওষুধের মত দরকারি ওষুধ অমিল হতে থাকল।

'৯০-এর দশকের শুরুতে শুরু হল অর্থনীতির উদারীকরণ, শিল্পে লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত হল, ওষুধ শিল্প সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিত হল। কোন্ ওষুধে কীরকম মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা ঠিক করা হতে লাগল বাজারে যেসব কোম্পানির বেশি বিক্রি তাদের ওষুধের দামের ভিত্তিতে। এই জটিল হিসেবটা না বুঝে জেনে নেওয়া যাক একটা তথ্য—বর্তমানে ৭৪টা ওষুধের কাঁচা মাল বা বাল্ক ড্রাগ এবং সেগুলো থেকে তৈরি ১৫৭৭টা ফর্মুলেশন মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায়। সম্প্রতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশে এক বিশেষ মন্ত্রীগোষ্ঠী ২০১১-র অত্যাবশ্যক ওষুধের জাতীয় তালিকায় থাকা ৩৪৮টা ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু যে জটিল হিসেবে তাঁরা দাম নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে ওষুধের দাম কমার বদলে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

এমন এক পরিস্থিতিতে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান রাজ্যের অন্তত কিছু মানুষের কাছে কম দামে ওষুধকে উপলব্ধ করবে এমনটা আশা করছেন অনেকে।

জনসাধারণকে কম দামে ওষুধ যোগানোর জন্য সরকারি হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের দোকান

২০১২-র জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর এক্সপ্রেশন

অফ ইন্টারেস্ট আহ্বান করে ৩৫ পাতার এক দলিল প্রকাশ করেন, উদ্দেশ্য নির্বাচিত কিছু সরকারি হাসপাতালে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা, যেখানে ওষুধ, চিকিৎসায় ব্যবহার্য সামগ্রী (consumables) এবং শরীরে স্থাপনযোগ্য সামগ্রী (implants) সর্বোচ্চ খুচরো দামের (ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস বা MRP) চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি করা হবে।

যে সব হাসপাতালে এইসব ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হবে বলা হলো, তার মধ্যে রয়েছে— কলকাতার ৫টি মেডিক্যাল কলেজ সহ মোট ৬টা হাসপাতাল; দার্জিলিং জেলায় নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ সহ ৩টি হাসপাতাল; উত্তর ২৪ পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে মেডিক্যাল কলেজ সহ ২টি করে হাসপাতাল; নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলী, বীরভূম ও পূর্ব মেদিনীপুরের ২টি করে হাসপাতাল; মালদার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ১টি করে হাসপাতাল। অর্থাৎ মোট ৩৫টি হাসপাতাল। এখন অবধি ৩২টা দোকান খোলা হয়েছে, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন কিছু দিনের মধ্যে সংখ্যাটি দাঁড়াবে ৫২।

এসব দোকানে কী কী পাওয়া যাওয়ার কথা?

- ১৪২টি ওষুধের জেনেরিক (জেনেরিক ওষুধ কাকে বলে তার ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হয়েছে) নামের এক তালিকা দেওয়া হয়েছে যে সব ওষুধ দোকান থেকে বিক্রি করতে হবে। পরে এই তালিকায় আরও ওষুধ যোগ করতে পারে স্বাস্থ্য দপ্তর। ওষুধের MRP (সর্বাধিক খুচরো দাম)-এর ওপর ৩০ শতাংশের বেশি ছাড়ে ওষুধ বিক্রি করতে হবে।
- বলা হয়েছে জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমে উল্লিখিত অন্য কোনও ওষুধ বা চিকিৎসাসামগ্রী যদি ১৪২-এর তালিকা থেকে বাদ পড়ে থাকে তাহলে তাও পাওয়া যাবে এসব দোকানে।
- পাওয়া যাবে ক্যান্সার-বিরোধী ওষুধ
- Consumable/Surgicals/Disposables/Dressing Materials পাওয়া যাবে ৩৯ রকম
- পাওয়া যাবে অর্থোপেডিক্সে ব্যবহৃত নানান সামগ্রী ও ইমপ্ল্যান্ট
- হৃদরোগ চিকিৎসায় ব্যবহার নানারকম পেস-মেকার ও স্টেন্ট পাওয়া যাবে
- পাওয়া যাবে ইমিউনলজিক্যাল নানা ওষুধ
- এ সব দোকানে বাচ্চাদের ব্যবহার্য পাউডার, সাবান, ক্রিম, লোশন, তেল ও মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রি করা যাবে
- বলা হয়েছে, এখান থেকে বেবি ফুড বা ইনফ্যান্ট ফুড বিক্রি করা যাবে না, কিন্তু ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে হেলথ ড্রিংক ও পুষ্টি-পরিপূরকগুলোকে (nutritional supplements), যেগুলো বেবিফুড-ইনফ্যান্ট ফুডের মতই অপ্রয়োজনীয়, প্রস্তুতকারী কোম্পানির মুনাফা বাড়ানো ছাড়া যেগুলো কোনও কাজে লাগে না।
- একটা ভালো বিষয় হল— নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নানা সময়ে কেন্দ্রীয় ওষুধ মহা-নির্দেশক দ্বারা নিষিদ্ধ ৭৬ ধরনের ওষুধ এসব দোকান থেকে বিক্রি করা যাবে না।

১৪২টি জেনেরিক ওষুধের তালিকাটা কী রকম?

তালিকা ঘেঁটে দেখা গেল—

- ১৪২-এর তালিকায় দু'বার করে উল্লেখ করা হয়েছে— ভিটামিন কে-৩, পভিডোন আয়োডিন সল্যুশন, পভিডোন আয়োডিন মলম, রিংগার'স ল্যাকটেট দ্রবণ, এড্রেনালিন ইঞ্জেকশন, ডোপামিন ইঞ্জেকশন, অক্সিটোসিন ইঞ্জেকশন, সোডিয়াম বাই কারবোনেট ইঞ্জেকশন, প্যারাসিটামল সিরাপ— মোট ৯টা ওষুধকে। *অর্থাৎ আসলে ১৪২ নয়, তালিকা ১৩৩টা দ্রব্যের।*
- তার মধ্যেও একই ওষুধের বিভিন্ন মাত্রা, বিভিন্ন রূপ (বড়ি/ক্যাপসুল/সিরাপ/ইঞ্জেকশন ইত্যাদি) আছে।
- তালিকা শুরু হয়েছে অযৌক্তিক ব্যথার মলম এসিক্লোফেনাক জেল দিয়ে।
- তালিকায় যেসব অযৌক্তিক নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ (fixed dose combination) পাওয়া গেল সেগুলো হলো— এমক্সিসিলিন ও ক্লক্সাসিলিনের মিশ্রণ, কাফ সিরাপ, লোসারটান ও হাইড্রোক্লোরোথায়াডাইডের মিশ্রণ, ওফ্লক্সাসিন ও ওর্নিডাজোলের মিশ্রণ, ওমপেরাজোল ও ডমপেরিডনের মিশ্রণ, রেবিপ্রাজোল ও ডমপেরিডনের মিশ্রণ— মোট ৬টা। (ওষুধ বিজ্ঞান সাধারণত নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ ব্যবহারের বিপক্ষে, কেননা— এদের একটা ওষুধের মাত্রা স্থির রেখে অন্যগুলোর মাত্রা কমানো বাড়ানো যায় না, সাধারণভাবে এগুলোর দাম আলাদা আলাদা ওষুধের মোট দামের চেয়ে বেশি, এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া একক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি।)
- তালিকায় এমন সব ওষুধ আছে যেগুলো এখন আর ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে (ভালো বা নিরাপদ বিকল্প আছে অথবা অপ্রয়োজনীয় বলে), যেমন— নিফিডিপিন ক্যাপসুল, এম্পিসিলিন ৫০০ মিগ্রা ক্যাপসুল, ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন সাইট্রেট সিরাপ।
- তালিকাটা ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল আসলে মাত্র ৯০টা কাজের ওষুধ আছে ১৪২-এর এই তালিকায়। ভারতের সাম্প্রতিকতম অত্যাবশক ওষুধের তালিকায়

আছে ৩৪৮টা ওষুধ। এই ৯০টা কাজের ওষুধের মধ্যে মাত্র ৬৮টা জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকাভুক্ত। অর্থাৎ ২৮০টা বা ৮০.৪৫ শতাংশ অত্যাবশ্যক ওষুধ আমরা এ সব ন্যায্যমূল্যের দোকানে পাবো না।

- পাবো না জীবাণুনাশক কোট্রাইমোক্সাজোল, উচ্চ রক্তচাপ কমানোর হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ও এটেনেলল, ডায়াবেটিসের গ্লিবেলক্ল্যামাইড ও গ্লিপিজাইড, এমন কত কী!

একটা বিষয়ে মনে হচ্ছে সরকার আইন ভাঙ্গায় প্রশ্রয় দিচ্ছে

আইন অনুযায়ী ফার্মাসিস্ট ছাড়া ওষুধের খুচরো দোকান চালানো যায় না। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান খোলা থাকবে ২৪ ঘণ্টা। ৮ ঘণ্টা কাজের সময় ধরলে অন্তত তিন শিফটে তিন জন ফার্মাসিস্ট লাগে একেকটা দোকানে। নির্দেশিকায় কিন্তু দোকান-পিছু একজন ফার্মাসিস্ট ও অন্তত চারজন সহায়কের কথা বলা হয়েছে, তার মানে হয় দিনে ১৬ ঘণ্টা ফার্মাসিস্ট থাকবেন না অথবা ফার্মাসিস্টদের ৮ ঘণ্টার বেশি সময় খাটানো হবে।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ

স্বাস্থ্য দপ্তর কী দেবে?

- ড্রাগ এন্ড কসমেটিক্স এক্ট অনুযায়ী ওষুধের পাইকারি দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা দেবে ভাড়ার বিনিময়ে। যেখানে তৈরি জায়গা নেই, সেখানে তৈরি করে দেবে।
- ২৪ ঘণ্টা বিনা মূল্যে জলের ব্যবস্থা করে দেবে।
- বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন করে দেবে। ব্যবসায়ীকে বিদ্যুৎ কোম্পানিকে বিল মেটাতে হবে।

ব্যবসায়ী কী করবেন?

- দোকান সাজাবেন
- আলাদা বিদ্যুতের মিটার লাগাবেন
- স্বাস্থ্য দপ্তরকে ঘর ভাড়া মেটাবেন
- ব্যবসা চালানোর পুঁজি লাগাবেন
- কর্মচারী ও সুরক্ষা কর্মী নিয়োগ করবেন
- দোকান খোলা রাখতে হবে ২৪ ঘণ্টা

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আমরা বিরোধী, কেন না তাতে সরকারি জমিতে, সরকারি নানা সুবিধা ও মদতে ব্যবসা চালিয়ে মুনাফা লোটে পুঁজিপতি, জনসাধারণের ঘাড় ভেঙ্গে। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে তাছাড়া অন্য কিছু হবে না। কেন এমনটা বলছি জেনেরিক ওষুধের দাম নিয়ে আলোচনা করার সময় বোঝা যাবে।

যে ভাবে সরকারি হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হচ্ছে তাতে ছোট ব্যবসায়ীরা অবলুপ্ত হয়ে যাবেন, মুনাফা লুটবে বড় ব্যবসায়ীরা।

- মেডিকাল কলেজগুলোতে দোকান চালানোর আবেদন করতে গেলে খুচরো দোকানদারদের গত দুবছরে গড় বার্ষিক টার্নওভার কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা হতে হবে। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালের ক্ষেত্রে অন্তত ৬ কোটি টাকা।
- বর্তমানে যাদের ওষুধের পাইকারি ব্যবসা বা পরিবেশক ব্যবসা আছে তাদের গত দুবছরে গড় বার্ষিক টার্নওভার হওয়া চাই মেডিকাল কলেজগুলোর জন্য আবেদন করতে গেলে অন্তত ১২ কোটি টাকা, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে অন্তত ৮ কোটি টাকা।
- বলা হয়েছে ব্যবসার পরিমাণ যার যত বেশি হবে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার তত সম্ভাবনা বাড়বে।
- ব্যাংক গ্যারান্টি রূপে সিকিউরিটি অর্থ জমা রাখবেন। পুরানো মেডিকাল কলেজগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোনটায় ৩০ লাখ, কোন কোনটায় ২০ লাখ। নতুন মেডিকাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে ১০ লাখ টাকা। মহকুমা হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে ৫ লাখ টাকা।
- বার-কোডিং ও অপ্টিকাল স্ক্যানারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- উপযুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।

এই ব্যবস্থায় ছোট ওষুধ দোকানি, পাইকারি বিক্রেতা বা সরবরাহকারী প্রতিযোগিতায় নামতেই পারবেন না, বলাই বাহুল্য। সরকারি জমিতে, সরকারের যোগানো খদ্দেরদের ওষুধ বেচে আরও ফুলে ফেঁপে উঠতে পারবে কেবল এপেলো, ফ্র্যাংক রস প্রভৃতির মতো বড় বড় ওষুধের দোকানের চেন।

এ ছাড় আসলে কোনও ছাড়ই নয়

বর্তমানে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানগুলি ৫১.০০ থেকে ৬৭.২৫ শতাংশ ছাড়ে ওষুধ বিক্রি করছে। হাসপাতাল ভেদে ছাড়ের মাত্রা আলাদা-আলাদা।

সারণি-২

হাসপাতাল ভেদে ছাড়ের মাত্রাভেদ

এসএসকেএম হাসপাতাল	৬৭.২৫%
মেডিক্যাল কলেজ	৬৬.২৫%
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ	৫৬.৬০%
বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিক্যাল কলেজ	৫১.০০%
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ	৫১.০০%
মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ	৫১.০০%
এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল	৫৪.০০%
বারাসাত জেলা হাসপাতাল	৬২.০০%
হাওড়া জেলা হাসপাতাল	৫৭.৩৬%
নদীয়া জেলা হাসপাতাল	৬০.৫০%
শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল	৫১.০০%

আমি একটি সংগঠনের সঙ্গে কাজ করি, যে সংগঠন গরিব মানুষদের জন্য কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার কয়েকটা

সারণি-৩

ওষুধের নাম	*যে দামে কিনি*	*এমআরপি*	*মুনাফা কতটা হতে পারে?*	*মুনাফার শতকরা হার*
এমোক্সিসিলিন ২৫০ মিগ্রা ক্যাপসুল	১.২৯ টাকা	৩.৯০ টাকা	২.৬১ টাকা	২০২%
এমোক্সিসিলিন ৫০০ মিগ্রা + ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড ১২৫ মিগ্রা	৮.৬৫ টাকা	৪১.৬৭ টাকা	৩৩.০২ টাকা	৩৮১%
সেট্রিজিন ১০ মিগ্রা বড়ি	০.১৯ টাকা	২.০০ টাকা	১.৮১ টাকা	৯৫২%
ডমপেরিডন ১০ মিগ্রা বড়ি	০.২৫ টাকা	৩.১০ টাকা	২.৮৫ টাকা	১১৪০%
গাবাপেন্টিন ১০০ মিগ্রা বড়ি	১.৫০ টাকা	৪.২০ টাকা	২.৭০ টাকা	১৮০%
এমিট্রিপ্টিলিন ১০ মিগ্রা	০.৩০ টাকা	১.১০ টাকা	০.৮০ টাকা	২৬৬%
এটেনেলল ৫০ মিগ্রা বড়ি	০.২২ টাকা	২.১৫ টাকা	১.৯৩ টাকা	৮৭৭%
এম্লোডিপিন ৫ মিগ্রা বড়ি	০.৩০ টাকা	২.২০ টাকা	১.৯০ টাকা	৬৩৩%
এনারাপ্রিল ৫ মিগ্রা	০.৪৮ টাকা	৩.০০ টাকা	২.৫২ টাকা	৫২৫%

ক্লিনিক চালায়। আমাদের ড্রাগ লাইসেন্সযুক্ত ওষুধের দোকানে কী দামে ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধ কিনি, কীই বা তাদের MRP— উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। (সারণী-৩)

যেখানে ১৮০ থেকে ১১৪০ শতাংশ লাভ হয় সেখানে ৪০-৭০ শতাংশ বা ৩০-৭০ শতাংশ কোনো ছাড়ই নয়।

ন্যায্যমূল্যের দোকানে যে সব কোম্পানির ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো গ্রামীণ ডাক্তারদের কাছে পাওয়া যাবে অনেক অনেক কম দামে। (সারণী-৪)

গ্রামীণ চিকিৎসকদের একটি সংগঠনের কাছে খবর পাওয়া গেল— এলাকার রোগীদের ক্রয়ক্ষমতা বিচার করে কেনা দামের ওপর তাঁরা যে লাভ রাখেন, তাতে এই ওষুধগুলোর দাম পড়ে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের তুলনায় অনেকটাই কম।

ওষুধের জেনেরিক নাম ও ব্র্যান্ড নাম

ওষুধের আসলে তিনটে নাম—রাসায়নিক নাম, জেনেরিক নাম (বা আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম) এবং ব্র্যান্ড নাম।

ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের আন্দোলনের যোদ্ধারা জেনেরিক নামের পক্ষে, কেননা—

- কেবল জেনেরিক নামই চিকিৎসাবিজ্ঞানর বইপত্রে-পড়াশুনায় ব্যবহৃত হয়।
- বাজারে একাধিক ওষুধের মিশ্রণে তৈরি প্রচুর ফর্মুলেশন পাওয়া যায়, যেগুলোর অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। জেনেরিক নাম ব্যবহার চালু হলে ওষুধ কোম্পানিগুলো বেশি সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন করতে বাধ্য হবে।
- ওষুধের নাম দেখেই সেটা কী ওষুধ বোঝা সহজ হবে। একই ওষুধের নানান ব্র্যান্ড নামে মিল থাকে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই বিভ্রান্তি দূর হবে।
- দেখা যায় জেনেরিক নামের ওষুধগুলোর দাম সাধারণভাবে সেই ওষুধেরই ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে অনেকটা কম দামের হয়।
- কেবল জেনেরিক নাম ব্যবহার করা হলে ডাক্তারদেরও অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই হবে, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হবে না।

সারণি-৪

জেনেরিক নাম	*ব্র্যান্ড নাম*	*প্রস্তুতকারী সংস্থা*	*বাজারজাত করে*	*ছাপা দাম (এমআরপি)*	*যে দামে গ্রামীণ ডাক্তার কেনেন*
অ্যালবেন্ডাজল	ABN	ম্যাস্কট, হরিদ্বার	নল	২২.৫০ টাকা	৩.০০ টাকা
,,	ZEEBEE ALU	সিনকম হেলথকেয়ার লি:, উত্তরাখন্ড	র‍্যানব্যাক্সি	১৩.৭৮ টাকা	২.৫০ টাকা
ফ্লুকোনাজোল	FLUZOL 150	স্কাইম্যাপ, রুরকি	বায়োকেম	৩৮.০০ টাকা	৪.০০ টাকা
,,	FLUCOBIG	বায়োজেনেটিক, হিমাচল প্রদেশ	ইউনিকেম	৩২.০০ টাকা	৪.৫০ টাকা
সেটিরিজিন	CITIXD	ভেনাস বায়ো-সায়েন্সেস প্রা: লি	কনসেপ্ট বায়ো-প্রডাক্টস প্রা: লি:	৩.৫০ টাকা	০.১৫ টাকা

- কেবল জেনেরিক নাম চললে ব্র্যান্ডের প্রচার-প্রসার করতে হবে না, খরচ কমবে, ফলে ওষুধের দামও কমবে।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের চালাকি

অধিকাংশ ওষুধ জেনেরিক নামে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় ব্র্যান্ডেড জেনেরিক রূপে— কোম্পানির জেনেরিক ডিভিশনের উৎপাদন, যার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, যে নাম কোম্পানি ডাক্তারদের কাছে প্রচার করে না, সরবরাহ করে হাসপাতাল বা অন্য প্রতিষ্ঠানে।

একই ওষুধের ব্র্যান্ডেড জেনেরিক বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন MRP-তে বিক্রি করে।

বিনোদ কুমার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর এক প্রকল্প (www.medguideindia.com) ওষুধ সম্পর্কে তথ্য যোগানোর এক নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট। যেখানে দুটো বহুল-ব্যবহৃত ওষুধের তথ্য দেখছিলাম— জ্বর-ব্যথা কমানো প্যারাসিটামল আর জীবাণুনাশক সিপ্রোফ্লক্সাসিন।

ওয়েবসাইটে ১৫৩টা কোম্পানির প্যারাসিটামল (৫০০ মিগ্রা)-এর খবর পেলাম। সবচেয়ে কমদামের জেনেরিক এসিকেম ল্যাবরেটরিস-এর, একটা বড়ির দাম ২২ পয়সা। সবচেয়ে বেশি দামের জেনেরিক ইউনির্ভাসাল ড্রাগ হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এর, একটা বড়ি ৩ টাকা ৬৪ পয়সা। সবচেয়ে কমদামি ব্র্যান্ড কিন্তু সবচেয়ে কমদামি জেনেরিকের চেয়েও কম দামের—এলবার্ট ডেভিড-এর Parazine, একটা বড়ি ১৫ পয়সা।

ওয়েবসাইটে ৫১৩টা কোম্পানির সিপ্রোফ্লক্সাসিন (৫০০ মিগ্রা) আছে। সবচেয়ে কমদামের জেনেরিক ক্যাডিলা-র একটা বড়ির দাম ১ টাকা ৫৪ পয়সা। সবচেয়ে বেশি দামের জেনেরিক এগ্রন রিমেডিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর, একটা বড়ি ৬ টাকা ১৮ পয়সা। সবচেয়ে কমদামি ব্র্যান্ড সবচেয়ে কমদামি জেনেরিকের চেয়ে অনেক কম দামের। আলট্রামেডিক্স-এর Ciplac, একটা বড়ি ৬০ পয়সা।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানগুলো বেশি দামের ব্র্যান্ডেড জেনেরিকের স্টক করছে। তাতে ছাড় দিয়েও যা দাম দাঁড়াচ্ছে, তা অনেক কোম্পানির ব্র্যান্ডেড ওষুধের দামের চেয়ে বেশি।

সরকার ডাক্তারদের ব্র্যান্ড নাম লেখা বন্ধ করতে চান

মেডিকাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ২০০২ সালে কোড অফ এথিকস-এ বলেছে ডাক্তারদের যথাসম্ভব জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন লেখা উচিত। বিভিন্ন সময় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকারি ডাক্তারদের ব্র্যান্ড নাম ব্যবহার করতে বারণ করেছে।

তাহলে ব্র্যান্ড নামে ওষুধ উৎপাদন হচ্ছে কেন? বাজারজাত হচ্ছে কেন? একদিকে সরকার ব্র্যান্ড নামের ওষুধ, অযৌক্তিক নির্দিষ্ট মাত্রার মিশ্রণ (irrational fixed dose combinations), ক্ষতিকর ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করতে দেবে আর ডাক্তারদের বলবে এসব লেখা যাবে না— এমন কি হয় নাকি!

সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তেমনটা করত যেমন করেছিল আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশের সরকার— অযৌক্তিক নির্দিষ্ট মাত্রার মিশ্রণ (irrational fixed dose combinations), ক্ষতিকর ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ করে।

সরকার কী করতে পারে?

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বর্তমানে জিডিপি-র ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে অন্তত ২.৫ শতাংশ করা। সরকার সমস্ত নাগরিকের জন্য প্রাথমিক, মধ্যম ও উচ্চস্তরের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারে তা হিসেব করে দেখিয়েছেন ডাঃ শ্রীনাথ রেড্ডি-র নেতৃত্বাধীন পরিকল্পনা কমিশনে স্বাস্থ্য বিষয়ক উচ্চস্তরীয় কমিটি। তাঁদের সুপারিশ—

- স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচের অন্তত ১৫ শতাংশ হোক ওষুধের জন্য, অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধগুলো সরকারকেই কিনতে হবে;
- আয়ুর্বেদ, উনানি, সিদ্ধ, হোমিওপ্যাথির আলাদা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা করতে হবে, রাজ্যস্তরে তা কেন্দ্রীয় ভাবে কিনতে হবে;
- প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি (Standard Treatment Guidelines) অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন ও ডিসপেন্সিং করতে হবে;
- স্বচ্ছ টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে ওষুধ কিনতে হবে;
- ভাল গুণমানের জেনেরিক ওষুধ নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রত্যেক জেলায় গুদাম থাকবে;
- ওষুধ, টিকা ও পরীক্ষার সরঞ্জাম কেনার জন্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা চাই;
- ওষুধের গুণবত্তা পরীক্ষার ল্যাবরেটরি নথিভুক্ত করতে হবে;
- দ্রুত দাম মেটানোর ব্যবস্থা চাই।

তাঁদের মতে, ওষুধ মানুষের নাগালে আনতে—

- ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- জাতীয় ও রাজ্যস্তরে ওষুধ সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপন করতে হবে;
- ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে ক্ষমতা দিতে হবে;
- ফার্মাসিউটিকাল দপ্তরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে দেওয়া হোক;

কেন্দ্র সরকারই বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ মানে নি। রাজ্য সরকারেরও দায় নেই মানার।

ওষুধ বিতর্ক

ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকান : এত বিতর্ক কেন?

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

২০১২ সালের জুন মাসে বেসরকারি ঔষধ বিক্রেতাদের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দরপত্র আহ্বান করে— বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ সহ ৩০টি হাসপাতালে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে Fair Price Shop বা ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকান খোলার জন্য। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে ঔষধ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজ্যের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের এক প্রধান অংশ এর জন্য খরচ হয়। তৎসত্ত্বেও রোগীদের কাছে উন্নতমানের ঔষধ সংগঠিত ভাবে পৌঁছে দেবার বহু সমস্যা আছে।

"...the DOHFW is still confronted with the issue of greater access to good quality of medicines by the people at aftordable cost as well as organised supply and delivery system, to cater for the needs of the people at all levels..."

শুধু ঔষধ নয়, নানা ধরনের প্রতিস্থাপন-যোগ্য বস্তু (Implants) ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এমন নানা উপাদানও (consumables) এর মধ্যে পড়ছে।

নথিতে বলা হয়, সরকারি হাসপাতালে যেসব রোগীরা আসেন, তারা মূলত হাসপাতালের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বাইরের ঔষধের দোকান থেকে কেনাকাটা করেন— যেসব দোকানের পণ্যদ্রব্যের মূল্য ও গুণমানের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। রোগীরা এর ফলে বহুক্ষেত্রেই প্রতারিত হয়। অনেক বেশি দাম দিতে হয় বা নিম্নমানের ঔষধ কিনতে হয়। অথচ হাসপাতালের চারপাশের ঔষধের দোকানগুলির ৬০ শতাংশ বিক্রয়ের উৎসই হল সরকারি হাসপাতালের রোগীরা। কিন্তু ঐসব দোকান কী দামে, কী 'ব্র্যান্ড' (Brand)-এর ঔষধ বিক্রি করছে সে ব্যাপারে হাসপাতালের কোনো নির্দেশনামা কার্যকর নয়। ফলে সরকার দরপত্রের মাধ্যমে হাসপাতালগুলিতে ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকান চালু করতে চান, নিম্নলিখিত শর্তে:

ক) ঔষধের দোকানগুলির জন্য সরকারি হাসপাতালে জায়গা ও জলের সংযোগ দেওয়া হবে— নির্ধারিত মাসিক ভাড়ার বিনিময়ে। বিদ্যুৎ সংযোগ এবং আর সব খরচ বিক্রেতার।

খ) দোকানগুলিতে ১৪২টি তালিকাভুক্ত ফর্মুলেশন ঔষধ বিক্রি করতে হবে 'জেনেরিক' নামে অর্থাৎ মূল বৈজ্ঞানিক নামে। যেমন— প্যারাসেটামল (Paracetamol)। বিভিন্ন কোম্পানির দেওয়া নিজস্ব ব্রান্ড নাম (Brand Name) চলবে না। যেমন—পাইরাজেসিক, ক্রোসিন, ক্যালপল, ম্যালিডান্স— এইসব নয়।

এখানে উল্লেখ করি যে, জেনেরিক (International Non proprietory Name) ঔষধের দাম কোম্পানির নিজস্ব নামের ঔষধের দামের চেয়ে অনেক কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্র ১০ বা ২০ শতাংশ। ঐ একই ঔষধ মালিকানাভুক্ত 'ব্র্যান্ড' নামে অনেক বেশি দামে বিক্রি করা হয়, নিম্নলিখিত কারণে—

১। উৎপাদন খরচের উপর কোম্পানির বিপুল মুনাফা থাকে। কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার শতাংশ।

২। সর্বোচ্চ খুচরো বিক্রয় মূল্য (MRP) ১০, ৫০, ১০০ গুণ বা তারও বেশি বাড়িয়ে লেখা থাকে— ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, স্টকিস্ট, পরিবেশক বা ঔষধের দোকানদারকে বিপুল কমিশন দিতে।

৩। ঐ দামের মধ্যে থাকে বাণিজ্য প্রতিনিধি (Medical Representative)-দের বেতন ও কমিশন, প্রচারের খরচ, বৈজ্ঞানিক আলোচনার (Scientific Seminar) নামে পাঁচতারা হোটেলে ডাক্তারবাবুদের বিলাতি মদের ককটেল পার্টির আপ্যায়নের ব্যয়, রাজনৈতিক দলের চাঁদা ইত্যাদি প্রভৃতি।

৪। চিকিৎসকদের উৎকোচের খরচ— নানা ধরনের বৈদ্যুতিন সম্ভার থেকে গহনা, স্বদেশে-বিদেশে ভ্রমণ থেকে বিলাসবহুল গাড়ি, গৃহস্থালির টুকিটাকি জিনিস থেকে পুত্র-কন্যার কলেজের বেতন। অবশ্যই ডাক্তারবাবুদের প্রেসক্রিপশন করার 'যোগ্যতা' অনুসারে।

বলাই বাহুল্য এইসব খরচই মেটান হতভাগ্য রোগী।

গ) ১৪২টি ঔষধ ছাড়াও, চিকিৎসায় ব্যবহৃত নানা ধরনের প্রতিস্থাপনের উপকরণ ও অন্যান্য উপাদানও (Implants and Consumables) পাওয়া যাবে। হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার ও স্টেন্টও মিলবে। এই তালিকায় নেই এমন ঔষধপত্র ব্র্যান্ড নামেও বিক্রি করা যাবে। এছাড়া জননী সুরক্ষা যোজনা (JSSK)-তে ব্যবহৃত সব ঔষধ রাখতে হবে।

ঘ) সমস্ত পণ্যের উপর (জেনেরিক অথবা ব্র্যান্ডেড) বিক্রেতাকে সর্বনিম্ন ৩০ শতাংশ ছাড় দিতে হবে খুচরো বিক্রয় মূল্যের (MRP) উপর। দরপত্র খোলার পর সর্বোচ্চ ছাড় যিনি দেবেন, তিনিই নির্বাচিত হবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, যেসব দোকানগুলি ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে যেখানে সর্বনিম্ন ৫১ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৬৭.২৫ শতাংশ (এসএসকেএম হাসপাতালে) ছাড় মিলছে রোগীদের।

ঙ) এই ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকানের পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালে যেসব ঔষধ বিনামূল্যে পাওয়া যেত (CMS)

তা অব্যাহত থাকবে। অতএব ঐ দোকান চালু করে সরকার বিনা পয়সায় ঔষধ দেওয়া থেকে হাত গুটিয়ে নেবে, এই আশংকা অমূলক। কোনো নিষিদ্ধ ঔষধ (Banned Drug) রাখা যাবে না।

জননী ও শিশু সুরক্ষা যোজনা (CMS)-র অধীনে সমস্ত মা ও সদ্যোজাত শিশুর চিকিৎসা (এক বছর বয়স পর্যন্ত) বিনামূল্যে করা হয়। যদি কোনো ঔষধ কিনতেও হয়, সরকার তার মূল্য সাথে সাথেই চুকিয়ে দেন রসিদ জমা দিলেই। প্রসবে ব্যবহৃত ও শিশুর প্রয়োজনীয় সমস্ত ঔষধও (১৪২টি তালিকায় না থাকলেও) এইসব দোকানে পাওয়া যাবে।

চ) দোকানগুলি চলবে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা এবং বছরে ৩৬৫ দিন। West Bengal Drug & Cosmetic Act অনুসারে সমস্ত শর্ত পূরণ করে বিক্রেতাকে লাইসেন্স (Drug licence) নিতে হবে। চুক্তি চার বছরের জন্য। সরকারের একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি (Monitoring cell) দৈনন্দিন কার্যকর্ম খতিয়ে দেখবে। কোনো বেআইনি বা অনৈতিক কাজ করলে চুক্তি খারিজ হয়ে যাবে। প্রতি মাসে বিক্রেতা কোম্পানি সরকারকে রিপোর্ট দেবে। ঠিকমত পরিষেবা না দিলে, বেশি মূল্য নিলে, নির্ধারিত ছাড় না দিলে, Drug and Cosmetic Act ভঙ্গ করলে, মেয়াদ-উত্তীর্ণ বা নিষিদ্ধ ঔষধ বিক্রি করলে, যোগ্যতাহীন কর্মীকে দিয়ে কাজ করালে, মজুত ঔষধ ও হিসাবে কারচুপি করলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আরও অনেক ধারা উপধারা আছে পঁয়ত্রিশ পাতার নথিটিতে। এই হল তার চুম্বকসার।

প্রতিক্রিয়া

গত ডিসেম্বর মাসে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে প্রথম ন্যায্যমূল্যের দোকানটি চালু হবার আগে থেকেই খুচরো ঔষধ ব্যবসায়ীদের 'সর্ববৃহৎ' সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোশিয়েশন বা বিসিডিএ মার-মার শব্দে আসরে নেমে পড়ে। আর পাঁচটা এলেবেলে দাবির মুখোশের আড়ালে তাদের প্রধান দাবি হল সরকারি হাসপাতালে এইসব অল্পমূল্যের জেনেরিক ঔষধের দোকান চালু করা চলবে না, জনগণকে ঔষধের দামের উপর ৫১-৬৭ শতাংশ ছাড় দেওয়া চলবে না। কেননা তাতে তাঁদের সমিতিভুক্ত দোকানগুলির ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে।

সম্পূর্ণ অনৈতিক হলেও বিসিডিএ-র পক্ষে এই বিরোধিতা করা স্বাভাবিক কারণ তাদের মুনাফার ঘাটতি পড়বে। কিন্তু অতি আশ্চর্য ঘটনা হলো যে সরকারি চিকিৎসকদের একাংশ (মূলত সরকারি চিকিৎসকদের ক্ষীণকায় একটি সংগঠনের দু-তিনজন কর্তাব্যক্তি) এই ঔষধ ব্যবসায়ীদের সাথে হাত মিলিয়ে প্রথম থেকেই একটি বিশেষ কর্পোরেট সংবাদপত্রকে মাধ্যম করে হাসপাতালের রোগীদের কম দামে জেনেরিক ঔষধ দেবার এই প্রচেষ্টাকে দ্বিচারিতা, ভণ্ডামি, ভাঁওতাবাজি প্রভৃতি চোখা চোখা বিশেষণে ভূষিত করতে থাকেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, এদের মধ্যে কয়েকজন দীর্ঘদিন ধরেই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও জেনেরিক ঔষধের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এতে রোগীদের উপর আর্থিক চাপ কমবে এবং বহুজাতিক ও অধিজাতিক কোম্পানিগুলির বলগাহীন মুনাফায় কিছুটা বাধা পড়বে বলে ওঁরা বক্তব্য রেখেছেন বা পত্রপত্রিকায় নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাদের উচিত ছিল সরকারের নূতন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে, তারপর তার ভুলত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা, সরকারের পর্যবেক্ষণ সমিতির (Monitoring community) কাছে নির্দিষ্টভাবে তাঁদের সুপারিশগুলি তুলে ধরা এবং ব্যবস্থাটি যাতে রোগীকল্যাণমূলক দুর্নীতিহীন ও স্বচ্ছ হয় তার জন্য মতামত প্রকাশ করা। তা না করে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার আগে থেকেই তাকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য তাঁরা কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমকে হাতিয়ার করে যে ধরনের 'আন্দোলন' আরম্ভ করলেন— তাতে ব্যবসায়ীদের সাথে তাঁদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অভিন্ন বলে মনে হয় সাধারণ মানুষের কাছে। বিসিডিএ-র সদস্যরা বহু বছর ধরে চূড়ান্ত বেশি দামে, বিপুল মুনাফা রেখে সাধারণ মানুষকে ঔষধ বেচেছেন। আজকের প্রতিবাদীরা প্রতিবাদ করেন নি। মাত্র এক বছর আগেই খুচরো ব্যবসায়ীদের ঐ সংগঠন সদস্যদের কাছ সার্কুলার পাঠায় যে কোনো রোগীকে এক পয়সাও ছাড় দেওয়া যাবে না। এই বেআইনি সার্কুলারের ফলে কেন্দ্রীয় সংস্থা Competition Council of India ঐ খুচরা ঔষধ ব্যবসায়ী সংগঠনকে ৪৭ লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছে। অথচ আজকের দরদি চিকিৎসকরা নিশ্চুপ ছিলেন। এমআর বাঙ্গুরে প্রথম দোকানটি খোলার পর ঐখানকার দালালচক্র চিকিৎসকদের হুমকি দেয় যে ন্যায্যমূল্যের দোকানে রোগী পাঠালে তাঁদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হবে। বিসিডিএ সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে হাজার হাজার রোগীকে পণবন্দী রেখে ২১ জানুয়ারি সব ঔষধের দোকানে রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট করে। সরকারি চিকিৎসকদের এই সংগঠন ও তার সাধারণ সম্পাদক তারও কোনো প্রতিবাদ করেন নি। এখন ঔষধের দোকান, ঔষধ কোম্পানি, বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সংগঠন, সরকারি হাসপাতালের দালালচক্র এবং কর্পোরেট সংবাদপত্রের (যাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস এইসব সংস্থার বিজ্ঞাপন) স্বার্থের সাথে প্রগতিশীল চিকিৎসরদের কণ্ঠস্বর ও স্বার্থ এক হয়ে যেতে দেখে শুধু বলতে পারি ''বড় বিস্ময় লাগে।''

সওয়াল ও জবাব

অভিযোগ - ১

ঔষধের দাম— এখন প্রচণ্ড চাপে পড়ে খুচরো ব্যবসায়ীরা এবং তাদের তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকরা বলছেন, এইসব ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকানগুলি আসলে (Branded Generic) ঔষধ বিক্রি করছে— অর্থাৎ বড় কোম্পানির তৈরি জেনেরিক ঔষধ, যার সর্বাধিক খুচরা বিক্রয়মূল্য প্রায় ব্র্যান্ডেড ঔষধের সমান, অথচ লভ্যাংশ অনেক

বেশি। ফলে ৬৭% ছাড় দিয়েও তাতে নাকি অনেক মুনাফা থাকছে। বিসিডিএ তাল দিয়ে বুক ঠুকে বলছেন— তারা আরও ছাড় দেবেন সাধারণ মানুষকে। দেখিয়ে দেবেন আরও কম দামে ঔষধ দেওয়া সম্ভব। প্রশ্ন হলো—এতদিন তা করেন নি কেন? ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ঔষধ বেচে পুরো লাভটাই তো চেঁচেপুছে বাড়ি নিয়ে গেছেন। ডাক্তারবাবুরাই বা এইসব 'রহস্য' রোগীদের জানান নি কেন? কেন দিনের পর দিন দামি ঔষধ লিখে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করেছেন? কিসের বিনিময়ে? আর সর্বত্র (Branded Generic) বিক্রি করা হচ্ছে ন্যায্যমূল্যের দোকানের থেকে, তা সম্পূর্ণ অনৃতভাষণ। নীতিতে বা কর্মপদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করাই যাবে। কিন্তু স্নানের জলের সঙ্গে শিশুটিকেও বিসর্জন দেওয়া অথবা মাথাব্যথা সারাতে মাথাটাকেই কেটে ফেলা কেমন বিধান?

অভিযোগ - ২

অবৈজ্ঞানিক ঔষধ— অভিযোগ উঠেছে, ১৪২টি ঔষধের তালিকায় কয়েকটি মিশ্র ঔষধ (Fixed dose combination), ঠিক, অবৈজ্ঞানিক ঔষধ ও অকাজের ঔষধ আছে। কিন্তু এই তালিকা তৈরি করেছেন সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির ঔষধ বিজ্ঞান বিভাগের চার জন এবং মেডিসিন বিভাগের তিন জন প্রথিতযশা অধ্যাপক। সরকারের কোনো মন্ত্রী নন। তালিকায় যদি ভুল থাকে (অন্তত প্রতিবাদী বিশেষজ্ঞরা যদি তা মনে করেন), তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপযুক্ত নথি সহ প্রতিবেদন জমা দেওয়াটাই স্বীকৃত পদ্ধতি, যাতে ভবিষ্যতে তা সংশোধিত হতে পারে। খবরের কাগজে টক-ঝাল-মিষ্টি বিবৃতি দেওয়া নয়। আর যারা অযৌক্তিক বলছেন, তাদেরও এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের যোগ্যতাও বিবেচনা করতে হবে বৈকি!

অভিযোগ - ৩

মাত্র ৩৫টি সরকারি দোকান বা ১৪২টি ঔষধ তালিকায় কেন?

স্বাস্থ্য দপ্তর স্পষ্ট করে জানিয়েছে, আপাতত ৩৫টি হাসপাতালকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ধাপে ধাপে সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ, জেলাসদর ও মহকুমা হাসপাতালে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সব হাসপাতাল) এমন দোকান চালু হবে। আর ১৪২টি ফর্মুলেশন— এর সাথে ৩৯টি সার্জিক্যাল, ৩টি কার্ডিয়াক ও ৩টি প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারের জিনিষপত্র পাওয়া যাচ্ছে ঐসব দোকানে। এটা ন্যূনতম। ক্রমে সংখ্যাটা বাড়ছে। কলকাতার দুটি মেডিক্যাল কলেজে ইতিমধ্যেই ৩৫০-এর উপর ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে। আর চুক্তি মোতাবেক সমস্ত জিনিষের ৫১ থেকে ৬৭ শতাংশ ছাড় দিতে দোকানগুলি বাধ্য, এমন কি তালিকা বহির্ভূত ব্র্যান্ডেড ঔষধের ক্ষেত্রেও।

অভিযোগ - ৪

দোকানগুলি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকলেও মাত্র ১ জন পাশ করা ফার্মাসিস্টে কাজ চালাচ্ছে

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। চুক্তিতে পরিষ্কার লেখা আছে, দোকানগুলিকে বর্তমান আইনের সব শর্ত মেনেই লাইসেন্স নিতে হবে। সমালোচক বরং বলুন, বেসরকারি দোকানগুলিতে কখন পাশ করা ফার্মাসিস্ট থাকেন, নাকি তাদের শংসাপত্র ভাড়া নিয়ে কাজ চালানো হয়।

অভিযোগ - ৫

ন্যায্য মূল্য কে স্থির করল? উৎপাদন মূল্যের স্থানে বাজারের দামের ভিত্তিতে ঔষধের মূল্য স্থির করা হচ্ছে কেন?

প্রশ্নটি যথাযথ কিন্তু ভুল জায়গায় করা হচ্ছে। পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ রেল দপ্তরে পাঠাবার মত। ঔষধের দাম স্থির করেন Drug Price Control Organisation (DIPCO), কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা। তারাই Cost Based Pricing-এর জায়গায় Market Based Price-এর নীতি অনুসরণ করে।

অভিযোগ - ৬

দরপত্র (Tender) জমা দেবার যোগ্যতা করা হয়েছে বছরে ৮ থেকে ১২ কোটি টাকার ব্যবসা। Earnest Money হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে ৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা। এইভাবে সরকার বড় বড় ব্যবসায়ীদের সুযোগ দিচ্ছে। আবার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বিরোধিতা করছে। এটা দ্বিচারিতা।

যারা এই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা প্রথমত সরকারি দরপত্র আহ্বানের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (১০০ শতাংশ FDI) এর বিষয়টিও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেন নি। নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি একটু বিবেচনা করে দেখুন—

(ক) সরকারি দরপত্রে বরাবরই ব্যবসার পরিমাণের উপরই নির্ভর করে উৎকর্ষ বা Quality বিচার করা হয়। এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি নেই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত দরপত্রের ক্ষেত্রেই মোট কত টাকার ব্যবসা করছেন, তা বিবেচ্য। মোট যত টাকার দরপত্র তার এক থেকে তিন শতাংশ ব্যাঙ্কে জমাও রাখতে হয় 'সিকিউরিটি' হিসাবে।

(খ) এর সঙ্গে খুচরো ব্যবসাতে বিদেশি বিনিয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই। ঔষধ ব্যবসাতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০২ সালে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন। সে স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু এইসব ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির ঠিকা যারা পেয়েছেন তারা ঔষধের পাইকারি ব্যবসায়ী হতে পারেন, কিন্তু এই সব সংস্থায় ১ শতাংশ-ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আছে, তার প্রমাণ কি কেউ দিতে পারবেন? বর্তমানে রাজ্যের রাজনৈতিক শাসক দল খুচরো ব্যবসাতে ৫১ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বিরোধী। কিন্তু দেশীয় বড় পুঁজির বিরোধী বলে তারা কবে ঘোষণা করেছে? আর পাঁচটা রাজ্য সরকারের মতো তারাও তো দেশি পুঁজিকে রাজ্যে আহ্বানের চেষ্টাই ক্রমাগত যাচ্ছে। তাহলে দ্বিচারিতার অভিযোগ ওঠে কেন?

অভিযোগ—৭

সমালোচকরা বলছেন সরকার নিজেই হাসপাতালগুলিতে দোকান চালিয়ে রোগীদের আরো বেশি সুবিধাজনক দরে ঔষধ

দিতে পারতেন। তারা এ বিষয়ে তামিলনাড়ুর উদাহরণ দিচ্ছেন। এই যুক্তি সম্পূর্ণ অবাস্তব। প্রথমত, তামিলনাড়ুতে সরকারি সংস্থা TN Medical Service Corporation গড়ে উঠেছে ১৮ বছর ধরে। তাদের ২৫টি আধুনিক গুদামখানা (Warehouse)ও প্রচুর যন্ত্রপাতি এবং কর্মচারী আছে। তারা নানা হাসপাতালও পরিচালনা করে। অপরপক্ষে বিগত ৩৪ বছর বিগত সরকারের সময় রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা তলানিতে ঠেকেছিল। ৫৪ শতাংশ ফার্মাসিস্টের পদ খালি সরকারি হাসপাতালে। অধিকাংশ স্থানে বেলা দুটোর পর বহির্বিভাগের ফার্মেসি বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে আলাদা করে সরকারি ঔষধের দোকান কে চালাবে? আর একই জায়গা থেকে বিনাপয়সায় CMS ঔষধের পাশাপাশি অন্য ঔষধ বিক্রি হলে ব্যাপক দুর্নীতির সম্ভাবনা থেকে যায়। তখন অর্ধ-শিক্ষিত মানুষদের ভুল বুঝিয়ে বিনা পয়সায় ঔষধের বিনিময়েও পয়সা নেওয়া হবে। ঔষধ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাও গত ৩৪ বছরে গড়ে ওঠেনি। এসব রাতারাতি করা যায় না।

অভিযোগ—৮

ন্যায্যমূল্যের দোকানে বেবিফুড, ন্যাপকিন বিক্রি হচ্ছে কেন?

West Bengal Drug and Camestie Act-এ একটা ঔষধের দোকানে যা যা রাখা যায়, সবই এইসব দোকানে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে সরকারি নথি সমালোচকরা পড়ে দেখতে পারেন।

উপসংহার

দিল্লীর AIIMS এর মডেলের অনুকরনে (যা বিগত ১৫ বছর সাফল্যের সাথে চলছে) এই ধরনের ঔষধের দোকান চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি সমস্ত সরকারি ডাক্তারদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত ব্যবস্থাপত্র (Prescription) জেনেরিক নামে লিখিত হবে। যারা এই নির্দেশ লঙ্ঘন করবেন, তাদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিতে পারেন জানতে পারার পরপ্রতিটি হাসপাতালে জেনেরিক ব্যবস্থাপত্র ২০-৩০ শতাংশ বেড়েছে বলে অধ্যক্ষরা জানিয়েছেন। মানুষের মধ্যেও বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে দেখান না, এমন বহু মানুষও ঔষধ কিনছেন ঐসব দোকান থেকে। দাম যাচাই করে নিশ্চিত হয়েই কিনছেন তারা।

বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে যে এই ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলোতে সবচেয়ে বেশি দামের ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধগুলোই বিক্রি করা হচ্ছে আইনের ফাঁক দিয়ে। ফলে ৫০/৬০ শতাংশ ছাড় দিয়েও কিছু ওষুধের দাম বাইরের সস্তার ব্র্যান্ডেড ওষুধের চেয়ে বেশি পড়ছে। আর ব্র্যান্ডেড জেনেরিকের এমআরপি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডেড ওষুধের প্রায় সমান। ফলে ছাড় দিয়েও অনেক লাভ থাকছে। সরকারের মনিটরিং কমিটিকে অবশ্যই দেখতে হবে যাতে এইভাবে ক্রেতারা প্রতারিত না হন। তবে ক্রেতারা সচেতন হচ্ছেন, দাম যাচাই করে ওষুধ কিনছেন। তাদের প্রতারণা করলে ঐ ফেয়ার প্রাইস শপগুলো বেশিদিন টিকবে না।

নূতন উদ্যোগে ভুলত্রুটি থাকবেই। তা সংশোধন করতে হবে। গঠনমূলক পরামর্শ দিতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হন। অসাধু ব্যবসায়ীরা উৎসাহ না পান। অন্তত এই প্রথম জেনেরিক ঔষধ নিয়ে সাধারণ মানুষ আলোচনা করছেন। জানতে চাইছেন বিষয়টা কী। ঔষধ সংস্থাগুলির 'রহস্যাবৃত' বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। চেতনা বাড়ছে। এটাই ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকানগুলির প্রাথমিক সাফল্য। সস্তার জেনেরিক ওষুধের সপক্ষে জনমত তৈরি হচ্ছে। মানুষ বুঝতে পারছেন, সস্তার ঔষধ মানেই খারাপ ঔষধ এটা মিথ্যা কথা। ব্যবসায়ীদের প্রচার।

এই সব প্রশ্নগুলিকে তুলে ধরার জন্যও রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প অভিনন্দন দাবি করতে পারে।

ওষুধের দাম, জেনেরিক নাম... ১৫ পাতার পর

রাজ্য সরকার কী করতে পারত?

- সরকারি হাসপাতালে ডিসপেনসারি ঘর রয়েছে, রয়েছেন সরকারি ফার্মাসিস্ট ও তাঁর সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারেন এমন কর্মী। সরকার নিজেই দোকান চালাতে পারত।
- আগে যে হিসেবের উদাহরণ দিলাম, তা খুচরো দোকান কী দামে কেনে তার উদাহরণ। পাইকারি বিক্রেতা কেনে আরও অনেক কম দামে। সরকার সে দামে বা বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক দাম (institutional price)-এ ওষুধ কিনে সামান্য মার্জিন রেখে অনেক কম দামে রোগীদের ওষুধ দিতে পারে, যদি সে সত্যি সত্যি জনসাধারণের উপকার করতে চায়।

সরকারি উদ্যোগের সমর্থক যাঁরা তাঁরা বলছেন— সরকার নিজে ওষুধ বেচা শুরু করলে দুর্নীতির উৎসমুখ খুলে যাবে। সরকারি কর্মচারীরা নানা স্তরের দুর্নীতিতে লিপ্ত হবেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথাই বলার। সরকারি উদ্যোগ-প্রতিষ্ঠান তুলে দিয়ে বেসরকারিকরণের প্রবক্তারা কিন্তু এই একই যুক্তি হাজির করেন।

পরিশেষে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার— ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কোন অভিনব জনমুখী উদ্যোগ নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভিশন ২০১৫'-এ সবার জন্য ওষুধের যে স্লোগান দেওয়া হয়েছে— তাতেই আছে এই ধরনের উদ্যোগের ভাবনা।

২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' হয়নি, ২০১৫-এর মধ্যে সবার জন্য ওষুধও হবে না, যত হাজার ন্যায্যমূল্যের দোকানই খোলা হোক না কেন। রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব না নিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ওষুধ অধরাই থেকে যাবে।

প্রবন্ধ

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও এদেশের ওষুধশিল্প

প্রদীপ রায়

দেশের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে বাণিজ্য করার অবাধ অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে মুক্ত প্রতিযোগিতায় নামতে হবে একযোগে উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল সমস্ত দেশকে—সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের এই হলো নতুন নির্দেশ। এরই জন্য বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের নির্দেশে দেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি বা গ্যাট এবং পরবর্তীতে একে দেখভালের জন্য বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার জন্ম এবং এই সংস্থায় যুক্ত হবার হুমকি—সবই একসূত্রে গাঁথা। বিশ্বায়নের নামে একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগড়ে সমগ্র বিশ্বকে বাঁধার ফিকির। গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে এই প্রক্রিয়ার যাত্রা শুরু, তা এখনও চলছে নতুন নতুন চেহারায়। এরই প্রেক্ষিতে দেশের ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি আগাম চিহ্নিত করা যাচ্ছে তাই নিয়েই এই নিবন্ধ।

তত্ত্বগতভাবে গ্যাটের স্বাক্ষরকারী দেশগুলি (পরবর্তীতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলি) সকলে সমান ক্ষমতার অধিকারী। ফলে এখানে যে সিদ্ধান্ত সহমত ভিত্তিক তা আপাতদৃষ্টিতে অবশ্যই গণতান্ত্রিক। কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। যেহেতু এই চুক্তি বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তাই বিশ্বব্যাপী এই বাণিজ্যকাণ্ডে যে যে দেশের অংশগ্রহণ সবচাইতে বেশি তাদের স্বার্থবাহী মতামতই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই দেশগুলি পশ্চিমের উন্নত দেশ, যাদের কব্জায় বিশ্ববাণিজ্যের সিংহভাগ।

গ্যাট চুক্তিতে স্বীকৃত বাণিজ্যের অভিন্ন নিয়মবিধি প্রবর্তন ও বিরোধের মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে নিয়ে তৈরি হয় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লুটিও), ১৯৯৫ সালের পয়লা জানুয়ারি। উন্নত দেশগুলির স্বার্থে তৈরি এই অভিন্ন নিয়মকানুনকে মানতে গিয়ে স্বল্প-উন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলির অর্থনীতি চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের পরবর্তী মিটিংগুলিতে ক্ষতিকারক ধারাগুলি, বিশেষ করে ট্রিপ্‌সের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দাবি সোচ্চার হয়। এই দাবির পিছনে ছিল বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং উত্তর-সাহারার দেশগুলিতে এইড্‌স-এর মহামারীর আকার ধারণ। এছাড়া ক্যান্সার, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত পেটেন্টকৃত ওষুধের আকাশ ছোঁয়া দাম এবং পিছিয়ে পড়া দেশগুলির জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দ্রুত ভাঙন। বাদ-প্রতিবাদে আলোচনায় অচলাবস্থা তৈরি হল। কারণ, পশ্চিমের দেশগুলির কাছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সনদ তো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ-স্বরূপ—অপরিবর্তনীয়।

এই দাবির ফলশ্রুতিতে নভেম্বর ২০০১-এ প্রকাশিত হয় 'দোহা ঘোষণা'।

এই ঘোষণায় প্রথম অনুচ্ছেদে স্বল্পোন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলিতে এইচআইভি/এইড্‌স, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মানুষের দুর্দশাকে উপলব্ধি করে স্বীকৃতি জানানো হয়। ৪(এ) অনুচ্ছেদে বলা হলো, ট্রিপস্ কোনও সদস্য দেশের নিজস্ব জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে নেওয়া পদক্ষেপের অন্তরায় হবে না। রোগাক্রান্ত মানুষের কাছে সস্তায় ওষুধ পৌঁছে দেবার অঙ্গীকারকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনুচ্ছেদ ৫(বি)-তে বলা হলা, প্রতিটি সদস্য দেশের নিজস্ব প্রয়োজনে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স প্রথার প্রয়োগ করতে পারবে এবং কোন্ অবস্থায় তা করবে সে ক্ষমতা সেই দেশেরই। অনুচ্ছেদ ৬(এ)-তে বলা হলো, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাভুক্ত যে দেশগুলিতে ওষুধ উৎপাদনের ক্ষমতা ক্ষীণ অথবা একেবারেই নেই এবং সেই কারণে ট্রিপস্ অনুমোদিত বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের প্রয়োগে বা কার্যকর ব্যবহারে অক্ষম তাদের জন্য এই ঘোষণায় ট্রিপ্‌স কাউন্সিলকে দায়িত্ব দেওয়া হল ২০০২ সালের মধ্যে এই সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ধারণ করে সাধারণ সংসদকে জানাতে হবে। এই সমাধানের সময়সীমা পরবর্তীতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

'দোহা ঘোষণা' এক অর্থে উন্নত দেশের বহুমুখী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থাকা দেশগুলির সোচ্চার ঘোষণা। যদিও এই ঘোষণা কতটা কার্যকর থাকবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে। এবার সেই আলোচনায় ঢোকা যাক এবং এই আলোচনার বিষয়বস্তু হবে মূলত ওষুধশিল্প।

সারা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এক গভীর সংকটে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের আশায় উন্নত দেশগুলি নানা ফন্দিফিকির রচনায় ব্যস্ত। 'দোহা ঘোষণায়' এই দেশগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাই নতুন পন্থায় অনুন্নত দেশগুলির উপর শর্ত চাপানোর চেষ্টা চলছে যাতে ক্ষুণ্ণ অধিকারগুলিকে ফিরে পাওয়া যায় আরও কঠিন শর্তে, যাকে বলা হচ্ছে ট্রিপ্‌স প্লাস।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্ধারিত পথ ছেড়ে তাই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক স্তরে মুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনান্তে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ায়। ১৯৯০ সালে গ্যাট অনুমোদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সংখ্যা ছিল ২০। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ২৫০টিরও বেশি, এবং এই চুক্তিগুলি দ্বারা বিশ্বের ৩০ শতাংশ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক স্তরে চুক্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি নিজস্ব স্বার্থ কায়েম করার সুযোগ পায় অনেক বেশি। তাই আজ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বিশ্ববাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে।

একথা মনে রাখা দরকার যে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সনদে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অবকাশ নেই, কারণ ঐ সংস্থায় প্রতিটি দেশের সমান অধিকার রয়েছে। ফলে প্রতিটি দেশ সমান সুযোগ পাবে এবং একই আইনের আওতাধীন হবে। এই কারণে দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করা যায় না যাতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সনদ লঙ্ঘিত হয়। নিয়ম তৈরি করে, নিজ স্বার্থরক্ষায় তা পরিবর্তন উন্নত দেশগুলির দস্তুর। এক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের সমাধানে একটা মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ১৯৯৪ সালে বিশ্ববাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগে বহুদেশ বা অঞ্চলের মধ্যে শুল্ক ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ছিল। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সনদের একটি ধারা বলে মুক্ত বাণিজ্যের এলাকা যেখানে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার আগে থেকেই স্বীকৃত, সেই চুক্তিগুলিকে মান্যতা দেওয়া হবে।

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলি আলোচিত হয় গোপনীয়তার আড়ালে। চুক্তির পূর্ণ চেহারা পাওয়া যায় চুক্তি সম্পন্ন হবার পর। ফলে এই চুক্তি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তির চাইতেও অনেক বেশি ক্ষতিকারক। আমাদের দেশে এই ধরনের চুক্তি, যার সাথে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাতে পার্লামেন্টের সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজনও হয় না। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার পথে উন্নত দেশগুলির শর্তাবলী ক্রমশ চেপে বসে অনুন্নত দেশগুলির উপর। আশিয়ান (অ্যাসোসিয়েশন্ অফ্ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন্‌স) ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হয় তা জানা যায় চুক্তি প্রকাশিত হবার পর এবং এক্ষেত্রে রাজ্যগুলির কোন ভূমিকাই ছিল না। অথচ এই চুক্তির ফলে সস্তায় পামোলিন তেল আমদানির কারণে কেরল রাজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই মুহূর্তে ভারত ৩০টি দেশ বা অঞ্চলের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় আবদ্ধ।

দ্বিপাক্ষিক স্তরে মুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনার মূল বিষয় বস্তুত দুটি দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে শুল্ক কেন্দ্রিক আলোচনা, যার অবলুপ্তি ঘটিয়ে অবাধ আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে উভয় দেশই লাভবান হয়। অথচ এই আলোচনার পরিসর বিস্তৃত করে এখন এর আওতায় আনা হয়েছে পরিষেবা, কৃষি, শিল্প সামগ্রী, ভেষজ শিল্প, বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি ইত্যাদি। পরিষেবার ক্ষেত্রে দাবি হলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, পরিবহন, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিকে উন্মুক্ত করা।

আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের তরফে এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক অথবা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতে তাই যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন শর্ত। যেমন পেটেন্টের সময়সীমা বাড়ানো, পেটেন্ট দানের শর্তাবলী, তথ্যের স্ব-অধিকার (ডাটা এক্সক্লুসিভিটি), প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত নীতি (কম্পিটিশন পলিসি), অ্যান্টি কাউন্টারফিটিং ট্রেডিং অ্যাক্ট (অ্যাকটা), কোম্পানি দ্বারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার অধিকার ইত্যাদি।

ভারত ও ২৭টি দেশ নিয়ে গঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে ২০০৭ সাল থেকে। আলোচনা চলছে গোপনীয়তার সাথে। ফলে আলোচিত বিষয়বস্তু অথবা দর কষাকষির বর্তমান অবস্থা কিছুই জনসমক্ষে এখনও আসেনি পূর্ণাঙ্গ চেহারায়। এর মধ্যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আলোচনার সূত্রে, জার্মানির পার্লামেন্টে বামপন্থী সদস্যদের দেওয়া স্মারকলিপি থেকে যা তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তারই ভিত্তিতে এই আলোচনা।

২০০৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমিশন এক নতুন বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করে, যার পোষাকি নাম গ্লোবাল ইউরোপ কম্পিটিং ইন্ দ্য ওয়ার্ল্ড। এই নীতিতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আরও আক্রমণাত্মক হবার অঙ্গীকার করা হয়। আগামী দিনের বাণিজ্য চুক্তিগুলিতে শুল্ক এবং অশুল্কজনিত বিধিনিষেধের অবলুপ্তি ঘটাতে হবে, যাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যবসা বাণিজ্য অবাধ হয়। মেধাস্বত্বের অধিকারকে আরও শক্তিশালী করা, পরিষেবার ক্ষেত্র অবাধ করা এবং বিনিয়োগ, সরকারি সংগ্রহ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয় যা তথাকথিত 'সিঙ্গাপুর ইস্যু' নামে খ্যাত তাকে আলোচনার শর্ত হিসাবে রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

যে বিষয়সমূহকে শর্ত হিসাবে রাখার প্রচেষ্টা সেগুলিকে এবার দেখা যাক।

পেটেন্টের সময়সীমা বৃদ্ধি (পেটেন্ট টার্ম এক্সটেনশন)— ট্রিপ্‌স নির্দেশিত নিয়ম বলে পেটেন্ট চালু থাকার সময়সীমা পেটেন্ট ফাইল করার সময় থেকে পরবর্তী ২০ বছর বলবৎ থাকবে। ভারতীয় পেটেন্ট আইন ১৯৭০-এ যেখানে ওষুধের ক্ষেত্রে পেটেন্টের সময়সীমা ছিল ৫ থেকে ৭ বছর, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য হবার সুবাদে তা পরিমার্জনা করে ২০ বছর করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দাবি, এই পেটেন্টের সময়সীমা আরও বাড়াতে হবে। কারণ ওষুধ শিল্পের নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যেমন ড্রাগ কন্টোলার বা পেটেন্ট অফিস, একটি পেটেন্টের আবেদনকে স্বীকৃতি দিতে অনেকটা সময় নেয়। তাই ৫-৭ বছরের বাড়তি সময়সীমা দিতে হবে। এর অর্থ, পেটেন্টের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পরও সস্তায় ঐ ওষুধের জেনেরিক তৈরি করা যাবে না। মেধাস্বত্বর একচেটিয়া অধিকারকে দীর্ঘায়িত করার এ এক অপচেষ্টা।

তথ্যের স্ব-অধিকার (ডাটা এক্সক্লুসিভ বা ডিই)— একটি নতুন ওষুধ বাজার জাত করার আগে ওষুধ শিল্পের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে বিভিন্ন ক্লিনিকাল/প্রি-ক্লিনিকাল ট্রায়ালের রিপোর্ট সহ প্রমাণ দাখিল করতে হয় যে ওষুধটি ঘোষিত রোগ নিরাময়ে কার্যকর, উৎকৃষ্ট ও প্রয়োগে নিরাপদ। এই তথ্যপুঞ্জ তাই গুরুত্বপূর্ণ। বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির দাবি, এই বিশেষ তথ্যর (এক্সক্লুসিভ ডাটা) একান্ত অধিকারী উদ্ভাবক

আবেদনকারী কোম্পানি এবং কোনও অবস্থায় এই তথ্যসম্ভার অন্য কোনও কোম্পানি ব্যবহার করে ঐ ওষুধের জেনেরিক তৈরি করে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ হিসাবে বলা হয় যে ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অন্তত ৮০ কোটি মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয় এবং এই খরচের ৬০ শতাংশই খরচ হয় বিভিন্ন ট্রায়াল সম্পন্ন করতে, যার সিংহভাগ আবার খরচ হয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার দ্বারা নির্ণীত নিয়ামাবলীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে। ফলে পেটেন্ট অধিকারের সময়সীমার মধ্যে অথবা তার পরেও কোন কোম্পানি যদি যেই পেটেন্টকৃত ওষুধের জেনেরিক তৈরি করতে চায় ডিই শর্তাধীন সময়সীমার মধ্যে, তবে তাকে নতুনভাবে ঐ ওষুধ সংক্রান্ত তথ্যপুঞ্জ তৈরি করতে হবে— যা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। এ ছাড়া মানবদেহে একই রাসায়নিক পদার্থের (এক্ষেত্রে ওষুধ) একাধিকবার ক্লিনিকাল ট্রায়াল হলে তা হবে অনৈতিক এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিকারক— হেলসিঙ্কি ঘোষণায় এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা আছে।

তথ্যের এই স্ব-অধিকার বা ডিই রক্ষার সময়সীমা আমেরিকায় নতুন ওষুধের ক্ষেত্রে ৫ বছর, প্রচলিত ওষুধের নতুন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৩ বছর, বায়োলজিক ওষুধের ক্ষেত্রে ১২ বছর। ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই সময়সীমা ৮ বছর।

তথ্যের স্ব-অধিকার আসলে পেটেন্টের মেয়াদ দীর্ঘায়িত করার অপচেষ্টা, কারণ একটি ওষুধের পেটেন্ট সীমা শেষ হবার পরও যতদিন তথ্যের স্ব-অধিকার বা ডিই বজায় থাকবে ততদিন শুধুমাত্র এই অধিকার বলেই ওষুধের জেনেরিক বাজারজাত করা যাবে না।

তথ্যের স্ব-অধিকার (ডিই) অধিকারীর কাছে এক অর্থে পেটেন্টের চাইতেও নির্ভরযোগ্য অধিকার। এর ফলে কোনও দেশের সরকার যার কাছে এই নতুন ওষুধের তথ্য সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব বর্তায় তার পক্ষে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স লাগু করে দেশের জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে ঐ ওষুধের সমমানের ওষুধ (জেনেরিক) তৈরি করা সম্ভব হবে না।

তথ্যের স্ব-অধিকার বা ডিই-র জনবিরোধী প্রয়োগের একটি উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক। কোলচিসিন প্রাচীনকাল থেকেই 'গাউট' নামক রোগের নিরাময়ের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি আমেরিকায় এই কোলচিসিন ট্যাবলেট প্রায় দুশো বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে গোত্র নামে বা শ্রেণীগত নামে। ফলে এর দাম ছিল নগণ্য। হঠাৎ একটি ওষুধ কোম্পানি এক সপ্তাহের একটি ট্রায়াল দিয়ে সেই তথ্য জমা দেয় আমেরিকার ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফডিএ-কে। এর ফলে তথ্যের স্ব-অধিকার বলে কোলচিসিন গোত্র-নামে বা জেনেরিকে আর কোনও কোম্পানির পক্ষে প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হয়। আর এই একচেটিয়া অধিকার বলে ঐ ওষুধের দাম ০.০৯ ডলার থেকে এক লাফে হয় ৪.৮৫ ডলার।

ট্রিপসের ৩৯ নম্বর ধারা ও তার বিভিন্ন উপধারায় বলা হয়েছে— একটি নতুন রাসায়নিক পদার্থ (এক্ষেত্রে ওষুধ) সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, যা উৎপাদন করতে প্রভূত সময় ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার গোপনীয়তা সুরক্ষিত রাখতে হবে, যাতে ঐ তথ্য অন্য কেউ বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার না করতে পারে। অপর পক্ষে তথ্যের স্ব-অধিকার বা ডিই-তে শর্ত হচ্ছে এই তথ্যাবলী শুধু সুরক্ষিত রাখা নয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (পেটেন্ট সীমার বাইরে) এই তথ্যের নিরঙ্কুশ অধিকার থাকবে উদ্ভাবকের। অর্থাৎ তথ্য সুরক্ষা (ডাটা প্রোটেকশন)— যা ট্রিপস নির্ধারিত এবং তথ্যের স্ব-অধিকার (ডাটা এক্সক্লুসিভ) — যা মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি বা এফটিএ নির্ধারিত— এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক।

কম্পিটিশন ল' (প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিধি)— মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আরেকটি শর্ত যা ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বিষয়বস্তু তা হলো বাজারের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে। দাবি করা হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড ঠিক করা হয়েছে ভারতেও সমতুল্য মান চালু করতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেশি বিদেশি সব সংস্থাকে বাজারের প্রতিযোগিতায় সমান সুযোগ দিতে হবে। এর অর্থ, দেশীয় কোনও শিল্পকে কোনরকম ভর্তুকি দেওয়া চলবে না।

যে কোনও দেশে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত নিয়মকানুন এমনভাবে তৈরি করা হয় যার হাত ধরে নিজস্ব শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং একচেটিয়াকরণকে প্রতিরোধ করা যায়, যার ফলে ক্রেতার অধিকার সুরক্ষিত থাকে। মুক্ত বাজার নীতি চালু হওয়ার পর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়াকরণ প্রতিরোধে 'এমআরটিপি' আইনগুলি ক্রমশ তার ধার হারিয়েছে। এ অবস্থায় উন্নত দেশগুলির স্বার্থ রক্ষার্থে এই নিয়মবিধির আরও লঘুকরণ অবশ্যই কাম্য নয়।

অ্যান্টি-কাউন্টারফিটিং ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা অ্যাক্টা— একটি অভিন্ন আইনি কাঠামোয় আন্তর্জাতিক স্তরে মেধাস্বত্বের অধিকারকে বাঁধার জন্য বহুজাতিক চুক্তি অ্যাক্টার সৃষ্টি। এই কাঠামোয় একটি নির্দিষ্ট মানের নিরিখে কাউন্টারফিট (নকল) পণ্য, জেনেরিক ওষুধ ও ইন্টারনেটে কপিরাইটের লঙ্ঘনকে চিহ্নিত করা হবে এবং এর দেখভালের জন্য বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, রাষ্ট্রসংঘ বা আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত সংস্থাগুলির (ডব্লুআইপিও) বাইরে একটি নতুন সংস্থা তৈরি করা হবে।

অ্যাক্টা সম্পর্কিত ভাবনার জন্ম ২০০৬ সালে জাপান, আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে আলোচনা সূত্রে। ২০১১ সালে এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে অ্যাকটা চুক্তি তৈরি হয় তাতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৯টি দেশ স্বাক্ষর করে এবং বর্তমানে তা বেড়ে দায়িয়েছে ৩১টি দেশ। সব চাইতে

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই চুক্তি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনায় উপরোক্ত দেশগুলি ছাড়াও অংশ নেয় করে আমেরিকার ভেষজ শিল্পের গবেষণা ও উৎপাদনগুলির সংস্থা (PhRMA)। কারণ এই চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ভেষজ শিল্পে মেধাস্বত্বের অধিকারকে আরও শক্তিশালী করা। এই চুক্তি বলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলিতে মেধাস্বত্ব অধিকারের আওতাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘন হলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে বিচার করা হবে। এই সব বস্তু যদি চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির কোনও অঞ্চলে, এমনকি ট্রানজিটে থাকা অবস্থায় বিমানবন্দর বা সমুদ্রবন্দরে ধরা পড়ে তবে তার বিরুদ্ধে মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের দায়ে ঐ দেশের মাটিতেই ফৌজদারি মামলা শুরু হবে। চুক্তির এই ধারাকেই সীমানা ব্যাপ্তি (বর্ডার মেজার) বলা হচ্ছে। একমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্র বাদ দিলে পেটেন্টকৃত বস্তু সামান্য পরিমাণে আনা হলেও তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। চুক্তিবলে ঐ লঙ্ঘনে শাস্তি হবে জেল এবং জরিমানা।

২০০৯ সালে প্যারিসের বিমানবন্দরে ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি ম্যাক্‌লয়েড ফার্মার তৈরি ১৭.৪ লক্ষ ক্লোপিডোগেল ট্যাবলেট (হার্টের অসুখে রক্ত বেশি তরল রাখার জন্য ব্যবহৃত) মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের দরুন বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঐ ওষুধ ভেনেজুয়েলার রপ্তানি হচ্ছিল এবং যাত্রাপথে ঐ বিমানবন্দরে ট্রানজিটে ছিল। মজার ব্যাপার, এই ওষুধটির রপ্তানিকারী দেশ ভারত ও আমদানিকারী দেশ ভেনেজুয়েলার পেটেন্টের অধীনে ছিল না। ভারত সরকার এ ব্যাপারে ট্রিপ্‌স কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করেছে। এর আগেও ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে নেদারল্যান্ড সরকার একই কারণে দুটি ভারতীয় ওষুধ কোম্পানির (ডাঃ রেড্ডি ও অরবিন্দ ফার্মা) তৈরি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের এবং এইচআইভি-র ওষুধ বাজেয়াপ্ত করে, যা রপ্তানি হচ্ছিল ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও নাইজেরিয়ায়।

অ্যাক্টা-র চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হলে ৬টি মহাদেশের জনস্বার্থ রক্ষাকারী সংগঠনগুলি, শিক্ষাজগতের মানুষ ও চিকিৎসক সমাজ এই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৫জন আইনবিদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছে স্মারকলিপি সহ এই চুক্তির বিরোধিতা করে। দেশে দেশে এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংঘটিত হতে থাকে। কারণ সহজেই অনুমেয়। ২০০১ সালে এইডস-এর পেটেন্টাধীন ওষুধের জেনেরিক যখন ভারতের দেশীয় ওষুধ কোম্পানি সিপ্‌লা তৈরি করতে শুরু করে তখন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির এই ওষুধের দাম ছিল রোগী-প্রতি বছরে ১০,৪৩৯ মার্কিন ডলার। বিপরীতে, সিপলার জেনেরিক ওষুধে খরচ ছিল প্রথমে ৩৫০ মার্কিন ডলার, বর্তমানে আরো কমে গিয়ে ৮০ মার্কিন ডলার।

অ্যাকটা আসলে ঘুরপথে বাণিজ্যের অবাধ অধিকারের পথে বাধার প্রাচীর, যাতে উন্নত দেশগুলি নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সুরক্ষিত রাখতে পারে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ট্রিপ্‌সের চুক্তি বা সনদে এই ধরনের চুক্তি অনুমোদনযোগ্য নয়।

সরকারি সংগ্রহ (গর্ভনমেন্ট প্রকিওরমেন্ট)— সাধারণভাবে প্রতিটি দেশের সরকার দেশের প্রয়োজনে নিজস্ব কোষাগারের খরচে সংগ্রাহকের ভূমিকা পালন করে থাকে। একেই সরকারি সংগ্রহ বা গভর্নমেন্ট প্রকিওরমেন্ট বলা হয়। বিভিন্ন সরকারি বিভাগ বা এজেন্সি বিভিন্ন পণ্য ও রসদ জোগাড় করে এর মাধ্যমে।

সংগ্রহের এই কাজটি সরকার করে থাকে উন্নয়নের এক অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো দেশীয় শিল্পের প্রসার ও বৃদ্ধি এবং আর্থসামাজিক বৈষম্যের মোকাবিলা করা। শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলি নয়, উন্নত দেশ তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিতেও এই সরকারি সংগ্রহকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় দেখা হয় এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

ভারত সরকার এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সংস্থাগুলি যাদের পুঁজির জোর কম এবং বাজারজাত করার পরিকাঠামোর অভাব তাদের এই সংগ্রহের ক্রয় তালিকায় সংরক্ষণ সহ বিশেষ সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিনিময়ে এই শ্রমনিবিড় শিল্পসমূহের মাধ্যমে এক বিশাল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া সরকারী সংস্থা, মহিলাগোষ্ঠী, তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়াও এর উদ্দেশ্য। সরকারি সংগ্রহ সেই অর্থে উন্নয়নের স্বার্থে জড়িত নৈতিকতার বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এদেশে ২৫০টি বড় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ১৮০০০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ওষুধ প্রস্তুতকারক রয়েছে যাদের অনেকেরই অস্তিত্ব সরকারি ক্রয়ের উপর নির্ভরশীল।

সাধারণ এই খাতে উন্নয়নশীল দেশে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ১৫-৩০ শতাংশ খরচ করা হয়। ভারত সরকারের এই খাতে বর্তমান খরচ বার্ষিক প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা। রেল, শক্তি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্মাণ, পরিষেবা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রের প্রয়োজনে এই সংগ্রহ করা হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির একটি শর্ত হিসাবে এই বাজারকে উন্মুক্ত করতে চায়, যাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সমান সুযোগসুবিধা নিয়ে এই সরকারি সংগ্রহের নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারে। এমনকি দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে যে বাড়তি সুযোগ রয়েছে

তা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে।

এই বাজার উন্মুক্ত করার অর্থ দেশীয় সংস্থাগুলিকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়া। সংগ্রহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দাপট অনেকগুণ বেশি হওয়ায় ঐ নিলামে অংশগ্রহণে তারা বাড়তি সুবিধা পাবে। অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরকারি সংগ্রহের ক্ষেত্রটি যদিও আপাতদৃষ্টিতে উন্মুক্ত, তবুও সেখানে অ-ইউরোপীয় দেশগুলির পক্ষে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য। এই ক্ষেত্রটির জন্যে একটি উচ্চ মান তৈরি করা হয়েছে যা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মানা অসম্ভব। এছাড়া অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা যথা ভাষা, তথ্যের অসমতা ইত্যাদি তো আছেই। টেন্ডারগুলি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিজস্ব জার্নালে স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় যা আমাদের দেশের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনায়ত্ত।

অপর একটি পর্যবেক্ষণে বলা হচ্ছে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই ক্ষেত্র উন্মুক্ত হলে ভারতের ব্যবসার পরিমাণ ১.১--১.২ কোটি মার্কিন ডলারের বেশী হওয়ার সম্ভাবনা কম। এছাড়া রাজ্যগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে এই শর্ত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সনদে অনুমোদিত নয়। বরং এখানে বলা আছে এই ক্ষেত্রে চুক্তি স্ব-ইচ্ছা প্রণোদিত। কোনও দেশ চাইলে সরকারি সংগ্রহের এই অভ্যন্তরীণ বাজার উন্মুক্ত নাও করতে পারে। যেহেতু এ যাবৎ মুক্ত বাণিজ্যের চুক্তিগুলিতে ভারত সরকার এই ক্ষেত্রটিকে আলোচনার বাইরে রেখেছে; ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এটা অন্তর্ভুক্ত হলে অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে জাপানের সাথে যে চুক্তি রয়েছে সেখানেও এই শর্ত বলবৎ হবে। একটি পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরকারি সংগ্রহের (পণ্য ও পরিষেবা) ০.৩৬ শতাংশ ইউনিয়নের বাইরের দেশ থেকে আসে। এমনকি ইংল্যান্ড যেখানে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ নাকি অনেক বেশি, সেখানেও সরকারি সংগ্রহের ক্ষেত্রে পণ্যের ০.২ শতাংশ ও পরিষেবার ০.১ শতাংশ মহাদেশের বাইরে থেকে আমদানি করা হয়।

বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসা (কোম্পানি-টু-স্টেট ডিসপিউট সেটেল্‌মেন্ট)— মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনায় বলা হয়েছে, কোনও দেশের সরকারের আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ণের দরুন যদি ঐ দেশে ব্যবসা-রত কোন বিদেশি বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক ক্ষতি হয় তবে সেই প্রতিষ্ঠান ঐ সরকারের বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।

বিনিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিষেবার ক্ষেত্রগুলিকে (যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্কিং, ইনস্যুরেন্স, পর্যটন) উন্মুক্ত করতে হবে যাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি এই ক্ষেত্রগুলিতে অবাধ প্রবেশের ছাড়পত্র পায়। এর অর্থ, উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে গরিব মানুষকে পরিষেবা পেতে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে। এই চুক্তির ফলে যে অবাধ বিনিয়োগের বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে তা দেশীয় শিল্পের অস্তিত্বের পক্ষে কতটা সংকট সৃষ্টি করবে তার মূল্যায়ন প্রয়োজন।

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি উন্নত দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের এক নগ্ন উদাহরণ। এই চুক্তির পাশে আবদ্ধ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর নিজস্ব ব্যবসায়িক স্বার্থ চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত।

অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উভয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে স্বপ্ন ফেরি করা হচ্ছে তা মরীচিকা মাত্র। এই মুক্ত বাণিজ্যচুক্তিগুলিতে প্রযুক্তি আমদানির বাধ্যবাধকতা নেই, নেই উন্নত উৎপাদন-কৌশল করায়ত্ত করার সুযোগ। অথচ এর ক্ষতিকারক দিকগুলি, বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশীদার দেশগুলির ক্ষেত্রে যা প্রকট, জনসমক্ষে এসেছে। এবং ঐ শর্তগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে ঐক্যমত্যে আসা সম্ভব হয়নি বলে এ বছরের প্রথমদিকে এই চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হওয়ার যে কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যাচ্ছে ভারত সরকার এই শর্তগুলির আলোচনায় দেশের স্বার্থে জোরালো সওয়াল করছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে জনমানসে এই চুক্তির কিছু শর্তের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হতে পারে তাই হয়ত বর্তমান ইউপিএ সরকার আগামী নির্বাচন পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত রেখেছে।

(**টীকা** : বাধ্যতামূলক বা কমপালসারি লাইসেন্স বা সিএল— এই ধারা বলে নতুন ওষুধ বাজারজাত করার জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়ার তিনবছর পর দেশের সরকার যদি মনে করে (ক) ঐ ওষুধ জনসাধারণের প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা (খ) ঐ ওষুধের দাম দেশের জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উর্ধ্বে, অথবা (গ) দেশের অভ্যন্তরে ঐ উদ্ভাবনা কার্যকর হচ্ছে না, তবে ঐ ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করার অধিকার অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানকে দিতে পারবে। বিনিময়ে ঐ প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট অধিকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট হারে রয়ালটি দেবে।

সূত্র

1. Govt. procurement in the EU-India FTA : Dangers for India', Ranja Sengupta, *EPW*, July 14, 2012
2. Anti-counterfeiting Trade Agreement : Wikipedia
3. *Implication of the Doha Declaration on the Trips Agreement and public health*, Carlos M. Correa, University of Buenos Aires, June 2002

প্রবন্ধ

আজকের পশ্চিমবঙ্গ : একটি পরিচয়

পার্থসারথি

পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গ

আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গ, পরিবর্তনশীল পশ্চিমবঙ্গ। এই বিশ্বে যে কোন সমাজ, যে কোন দেশ, যে কোন রাজ্যের মতো এই রাজ্যও সর্বদা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। ৩৪ বছরের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে এই রাজ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে অনেকে যেমন উল্লসিত, অনেকে বিমর্ষ, আবার কেউ কেউ নিরুত্তাপ। নতুন সরকারের সমর্থকরা বলছেন, বাম জমানা থেকে মুক্তি পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন দুর্দম গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিরোধীরা বলছেন, নতুন জমানায় রাজ্যের অবস্থা আগের থেকে খারাপ বই ভালো হয়নি। অন্যরা বলছেন, এটা কোনো পরিবর্তনই নয়, আসলে 'রাজা আসে যায়, রাজা বদলায়, ...জামা কাপড়ের রং বদলায়...., দিন বদলায় না'। বিপ্লব ছাড়া যে কোন পরিবর্তন অর্থহীন। এই বিভিন্ন অবস্থানের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল হোল, সবাই রাজনৈতিক পালা-বদলকে (সংসদীয় বা বৈপ্লবিক) পরিবর্তনের একমাত্র বা প্রধান মাপকাঠি বলে বিবেচনা করেন। ক্ষমতার রাজনীতিতে একটা বড়ো মাপের পরিবর্তন না হলে তাঁরা খুশি হন না, সমাজের গভীরে দৈনন্দিন জন-জীবনে পরিবর্তনের অন্তঃসলিলা প্রবাহকে বুঝতে এবং গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেন।

আসলে কিন্তু জমানা পাল্টাক বা না পাল্টাক, কোনো সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। জমানা বদলের ওপর সমাজের বদল একটা পরিমাণে নির্ভর করে ঠিকই, কিন্তু একইভাবে এটাও সত্য যে সমাজে ঘটে চলা পরিবর্তনগুলির ওপর আবার জমানার পরিবর্তন অনেকখানি নির্ভর করে। একথা সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আরো বেশি সত্য। পরিমাণগত পরিবর্তন অবিরত না হলে গুণগত পরিবর্তন আকাশ থেকে পড়ে না। সুদীর্ঘকাল ধরে দৈনন্দিন সমাজ-জীবনে ঘটে চলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে, গণ অসন্তোষ জমতে জমতে একদিন বিস্ফোরণ ঘটে, গুণগত পরিবর্তনের জমি তৈরি হয়। তাই একটি দেশ বা রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন থাকুক না থাকুক, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নজরে পড়ার মতো আলোড়ন থাকুক না থাকুক, পরিবর্তনের চোরাস্রোত সমাজের অন্দরমহলে নিরন্তর বয়ে চলে, যার সুলুক-সন্ধান সমাজ-বিপ্লবী ও সমাজ-গবেষক উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের এক প্রবীণ বিপ্লবী কিছুদিন আগে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, খুব খারাপ সময় চলছে, কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না। আজকের সমাজ নিয়ে বিপ্লবী শিবিরে এমন আক্ষেপ কান পাতলেই শোনা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যিই কি কিছু বদলাচ্ছে না? সময়টা কি সত্যিই খারাপ?

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি বিবেচনা করা যাক। এই রাজ্যে দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট রাজত্ব করেছে, যে রাজত্বে পূর্বতন কংগ্রেসি জমানার থেকে কোনো গুণগত পরিবর্তন আসেনি, আনার চেষ্টাও হয়নি। সেই হিসেবে বলা যায়, বামফ্রন্ট মূলত স্থিতাবস্থাকেই রক্ষা করেছে, হয়তো বা কংগ্রেসের থেকেও আরো ভালোভাবে চলতি ব্যবস্থার সেবা করেছে। কিন্তু বামফ্রন্টের হাত ধরে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি বলে এই ৩৪ বছর ধরে পশ্চিমবাংলার সমাজ কিন্তু থেমে ছিল না।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের সমাজও মূলত গ্রাম ভিত্তিক। গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের ওপরেই রাজ্যের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজ্য-রাজনীতির পরিবর্তন প্রধানত নির্ভরশীল। তাই পরিবর্তনের খোঁজ খবর করতে হলে আমাদের গ্রাম-বাংলার দিকেই মূলত নজর দিতে হয়। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরে গ্রাম-বাংলার সমাজ ক্রমাগত পাল্টিয়েছে, শাসকদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে পার্টিতন্ত্রের কঠোর বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে সমাজ আপন নিয়মে এগিয়ে চলেছে। শাসকরা চলতি ব্যবস্থা আর তার মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন, ছিটেফোঁটা ভূমি-সংস্কার, সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি রূপায়ণ এবং সর্বোপরি বিগত দুই দশকে বিশ্বায়নের পর্বে বাজার অর্থনীতির অনুপ্রবেশের স্বার্থে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-বাজার প্রভৃতির প্রসার, এগুলি গ্রামীণ সমাজে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের রাস্তা খুলে দিয়েছে। গত কয়েক দশকে গ্রামীণ অর্থনীতি যেমন বিশ্ব-অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়ে গেছে, তেমনি গ্রামীণ সমাজ-রাজনীতিও রাজ্য তথা দেশীয় রাজনীতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। রাজ্যের এক প্রান্তে ঘটে যাওয়া একটা সামাজিক আলোড়ন অন্য প্রান্তের প্রান্তিক জনসমাজকে পর্যন্ত আলোড়িত করে তুলছে। এটা কি একটা ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন নয়?

২০০৬ সালের মাঝামাঝি যখন সিঙ্গুর আন্দোলন শুরু হলো, তখন তাকে অনেকেই মামুলি একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে দেখেছিলেন। কেউই তখন ভাবতে পারেনি যে, এই জমি-রক্ষার আন্দোলন নন্দীগ্রামে পৌঁছে এমনভাবে গোটা রাজ্যকে আলোড়িত করবে যার ধাক্কায় এতদিনের সুপ্রোথিত বামফ্রন্ট সরকার উৎপাটিত হবে। খুবই স্থানীয় দুটো আন্দোলনের এমন রাজ্যব্যাপী প্রভাব ষাট-সত্তর দশকে ভাবাই যেত না। ১৯৬৬ সালে খাদ্য-আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস সরকারের পতন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেদিন খাদ্য-সমস্যা আর তার সাথে

কালোবাজারি-মজুতদারি গোটা রাজ্যের জনগণের কাছে বেঁচে থাকার আশু সমস্যা হিসেবে হাজির হয়েছিল। অন্যদিকে ১৯৬৭ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের কিছুদিনের মধ্যেই নকশালবাড়িতে কৃষক-হত্যা ঘটানোর পরও যুক্তফ্রন্টের দলগুলো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপিতে নির্মম অত্যাচার চালিয়েও পার পেয়ে গেছিল বামফ্রন্ট সরকার। মিডিয়ার যে সর্বব্যাপী উপস্থিতি নন্দীগ্রামের ঘটনায় রাজ্য জুড়ে জনরোষ সৃষ্টি করলো, মিডিয়ার সে ভূমিকা সেদিন অকল্পনীয় ছিল। গত দুই দশকে তথ্য-প্রযুক্তির যে বিকাশ সাম্প্রতিককালে দেশে দেশে স্বৈরাচার আর পুঁজি-বিরোধী আন্দোলনের দরজা খুলে দিচ্ছে, এ রাজ্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে তার এক ঝলক আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই বিকাশ বিশ্ব-পুঁজির হাত ধরে হচ্ছে বলে গণ-সংগ্রাম বিকাশে তার ইতিবাচক প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি কি?

দুনিয়া-জুড়ে ঘটনার বিকাশ কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে, তথ্য-প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন প্রচার-মাধ্যমের অভূতপূর্ব প্রসার সমাজ-জীবনে, এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামীণ সমাজেও, আন্দোলন-আলোড়ন সৃষ্টি করতে সহযোগী ভূমিকা নিতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে ভারতে রেল লাইনের প্রসারকে মার্কস স্বাগত জানিয়েছিলেন এই কারণে যে, এর ফলে ভারতের জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবিরোধী লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। সেই দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে, বিগত দুই দশকে ঘটে যাওয়া বিশ্বায়নের ফলাফল শুধুই নেতিবাচক বলে কেন বিবেচিত হবে? বামফ্রন্টের গোড়ার দিনগুলোর সাথে শেষের দিনগুলোর সামাজিক-ঐতিহাসিক পার্থক্য কেন আমাদের নজর এড়িয়ে যাবে? ইতিহাসের চাকা তো কখনো থেমে থাকে না। সাধারণ মানুষের, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম, জীবন-যাপন জীবন-ধারণের জন্য প্রাত্যহিক লড়াই ইতিহাসের চালিকা-শক্তি হিসেবে কাজ করে চলে। আমরা তা দেখি বা না দেখি, তার গুরুত্ব বুঝি বা না বুঝি, তাতে যায় আসে না।

এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গকে বুঝতে হলে তার সতত পরিবর্তনশীল সমাজকে বুঝতে হবে, বিশেষত গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের অন্তঃসলিলা প্রবাহটির হদিশ পেতে হবে। বাইরে থেকে যে ঘটনাগুলো মামুলি বলে মনে হয়, তার অন্তর্নিহিত প্রভাবকে হিসেবের মধ্যে আনতে হবে। যেমন কিনা বিগত দুই-তিন দশকে গ্রাম-বাংলা থেকে ভারতের বিভিন্ন শহরে, এমনকি বিদেশে পর্যন্ত অভিবাসনের ঘটনা দুরন্ত গতিতে বেড়ে চলেছে। অনেক গ্রামে দেখেছি, যুবক-তরুণদের অর্ধেক জীবিকার সন্ধানে বাইরে চলে গেছে। তরুণ প্রজন্মের এই বিপুল সংখ্যায় অভিবাসন তথা মাইগ্রেশন নিঃসন্দেহে গ্রাম-সমাজকে প্রভাবিত করছে, গ্রামের সমাজ-রাজনীতিতে একটা পরিমাণে পরিবর্তিত করছে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রাম-বাংলার বহু অঞ্চলে ইদানিং কৃষি-শ্রমিকের অভাব ঘটছে, যার ফলে কৃষিতে মজুরি বৃদ্ধি ঘটছে অভূতপূর্ব হারে (২০১০ সালে সমীক্ষার কাজ করতে গিয়ে দেখেছিলাম, দক্ষিণবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কৃষি-মজুরি ৫০-৬০ টাকার বেশি ছিল না, ২০১৩ সালে সেই মজুরি ২০০-২৫০ টাকায় পৌঁছিয়েছে)। এটা কোনো সরকারি দাক্ষিণ্যে বা আইন করে হয়নি, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনের হাত ধরে হয়েছে। এই বিবর্তনের চরিত্র নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলার গ্রাম-সমাজ আর আগের জায়গায় নেই। সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক—সর্বক্ষেত্রে সেখানে প্রভূত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পুরনো প্রজন্মের সাথে নতুন প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতার দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছে। একথা গ্রাম-শহর সকল ক্ষেত্রেই সত্য। পরিবর্তনের এই অন্তহীন স্রোতকে স্বীকার করে নিয়ে, তার মধ্যেই খুঁজতে হবে আজকের পশ্চিমবঙ্গকে, তার চলার গতিপথকে।

এক রাজ্য অনেক বিশ্ব

পশ্চিমবঙ্গের অপর পরিচয় এই রাজ্য মূলত বাংলা-ভাষী জনজাতির আবাস হলেও এর মধ্যে রয়েছে বহু শ্রেণী, স্তর, বর্ণ, ধর্ম ও বর্গের মানুষ, এমনকি বহু ভাষা-ভাষী মানুষ। অঞ্চল-ভেদে যাদের মধ্যেকার বৈশিষ্ট্যগুলো আবার আলাদা হয়ে যায়। যেমন কিনা এরাজ্যের বাঙালি অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছেন হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলিমরা সংখ্যালঘু হলেও মোট জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ জুড়ে রয়েছেন তাঁরা। মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় তাঁরাই সংখ্যাগুরু। আবার হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জাত বা বর্ণের মানুষ, যাদের মধ্যে সামাজিকভাবে অন্ত্যজ অবহেলিত তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন ২৩ শতাংশের ওপর। এছাড়া রাজ্যের জনসংখ্যার ৫.৫ শতাংশ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, যাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি বাঙালিদের থেকে একেবারে আলাদা। উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের একটা বড়ো অংশ রাজবংশী ও গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ, যাদের ভাষা-সংস্কৃতি মূলধারার বঙ্গ সংস্কৃতি থেকে অনেকাংশে ভিন্ন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মুসলিম-এসসি-এসটি এই তিনটি সামাজিকভাবে অবহেলিত এবং আর্থিক দিক থেকে বঞ্চিত সম্প্রদায় কিন্তু সম্মিলিতভাবে এরাজ্যে সংখ্যাগুরু। আর গ্রামবাংলায় তো জনসাধারণের তিন ভাগের দুই ভাগই হচ্ছেন এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ শুধু আর্থিক-সামাজিক দিক থেকেই নন, রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও এই সম্প্রদায়গুলোর প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম, প্রকৃত ক্ষমতা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কুক্ষিগত। এইভাবে সামাজিকভাবে ব্রাত্য উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলো অন্যান্য সব দিক থেকে বঞ্চিত হবার ফলে সব মিলিয়ে এই রাজ্যে দুটি সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে— ভদ্রলোক

আর ছোটলোক। ভদ্রলোকেরা মূলত উচ্চবর্ণের ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু, যারা ১৯৪৭ সালে এই রাজ্যের জন্মলগ্ন থেকে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আধিপত্যের অবস্থানে রয়েছেন। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে দুটো আলাদা জগৎ তৈরি হয়েছে, একটা তথাকথিত ভদ্রলোকদের জগৎ, আরেকটি ছোটোলোকদের।

গত দুই-তিন দশকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের রমরমা হওয়ার ফলে একেবারে শিশু বয়স থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি সব দিক থেকে আলাদা দুটো জাত তৈরি হচ্ছে, যারা একই জাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের ভাষা বোঝে না, একে অপরের সহমর্মী হওয়া তো অনেক পরের বিষয়। বস্তুত চিরাচরিত ভদ্রলোকদের মধ্যেও এখন দুটো গোষ্ঠীকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়, একটা ইংলিশ-মিডিয়াম-শিক্ষিত ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী, যারা ছোটবেলা থেকে ঠাটে-বাটে সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হয়, বাংলাভাষায় কথা বলতে কষ্ট পায়, যারা ইংরেজি বলতে পারে না তাদের করুণার চোখে দেখে। ইংরেজি শিক্ষার দৌলতে এরাই চাকরি-বাকরির প্রতিযোগিতায় অন্যদের পেছনে ফেলে তরতর করে এগিয়ে যেতে পারে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উঁচু পদ এদের জন্যই বাঁধা থাকে। যদিও এদের কাছে দেশে 'পড়ে থাকার' থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় যাওয়া, সেখানেই শিক্ষালাভ করে চাকরি জুটিয়ে ডলারে রোজগার করা অনেক বেশি কাম্য। অন্যদিকে যারা বাংলা মাধ্যমে 'পড়ে রইলো', তারা অভাগার মতো একগুচ্ছ ডিগ্রি নিয়েও ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রাথমিক স্কুলে মাস্টারির চাকরির জন্য পাঁচ-ছ ঘণ্টা ঠা-ঠা রোদে রাস্তায় লাইন দিচ্ছে, বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বল্প মাইনের চাকরির জন্য সোর্স খুঁজছে, নেতা ধরছে, কেউ বা দু-চার লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে সরকারি চাকরিতে ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আমার মনে হয়, এরাজ্যে আসল সংখ্যালঘু হচ্ছেন উচ্চ-বর্ণের অভিজাত ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুরা, যারা রাজ্যের ব্যাপক জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন, যারা গ্রামের মানুষদের 'গেঁয়ো' বলে দূরে সরিয়ে রাখেন, শ্রমজীবী মানুষদের ঘৃণার চোখে দেখেন, খুব বেশি হলে দয়া-দাক্ষিণ্য করেন। নিজেরা শ্রম-বিমুখ, বাক্যবাগীশ, দ্বিচারী। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে এদেরই আধিপত্য, যদিও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই রাজ্যে আধিপত্য রয়েছে ভারতীয় বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির। বাঙালি পুঁজিপতিদের অবস্থান উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে ক্রমাগত দুর্বল হয়েছে, বাঙালি-মালিকানার শিল্প-কারখানা বেশিরভাগ বন্ধ অথবা রুগ্ন হয়ে পড়েছে। সেদিক থেকে দেখলে, এটাকে একটা স্ববিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থনৈতিক ক্ষমতা আর সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, ক্ষমতার প্রতিভূ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, ক্ষমতার রং বদলালেও আর্থিকভাবে প্রতিপত্তিশালী বৃহৎ পুঁজির সেবায় কোনো খামতি হয় না। বাঙালি অভিজাত ভদ্র-সম্প্রদায় একদা ব্রিটিশ প্রভুর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, আজও তাঁরা সাহেবদের ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে সাহেব হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গোলামি যাদের রক্তে এতটাই মিশে গেছে যে সাহেবদের ভাষা, সাহেবি আদব-কায়দা অনুকরণ না করতে পারলে তাঁদের জাতে ওঠা যায় না, তাঁদের কাছে অধুনা দেশি-বিদেশি পুঁজির গোলামি আর বড়ো কথা কি?

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কিন্তু আর্থিক-সামাজিক আধিপত্যের জায়গায় একটা স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে গ্রাম-বাংলায় বারংবার জোতদার-জমিদার-বিরোধী আন্দোলন (সেই তেভাগার সময় থেকে) পুরনো ভূস্বামীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অনেকটাই খর্ব করেছে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে বংশানুক্রমে জমির ক্রমাগত খণ্ডিত হওয়া, এবং সবকিছু মিলিয়ে বৃহৎ জোতের প্রায় অবলুপ্তি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আজকের পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের হাতেই রয়েছে বেশির ভাগ জমির মালিকানা। উচ্চবর্ণের অভিজাত জমিদার বংশোদ্ভূত পরিবারগুলো গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রতিপত্তি হারিয়ে অনেকেই বর্তমানে স্থায়ীভাবে শহরের বাসিন্দা হয়েছেন। গ্রাম-বাংলায় গত চার দশকে জমির মালিকানা বিন্যাসে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, তার সরকারি হিসেব দেওয়া হল পর পৃষ্ঠার সারণীতে।

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনশীল জমির ৮৫ শতাংশ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের হাতে, যাদের সংখ্যা মোট জমির মালিকের ৯৭ শতাংশের ওপর। প্রান্তিক কৃষক হচ্ছেন তারা, যাদের জমির পরিমাণ ৭.৫ বিঘার কম আর ক্ষুদ্র কৃষক মানে যাদের হাতে ১৫ বিঘা বা তার কম জমি আছে। অন্যদিকে ১০ হেক্টর বা ৭০ বিঘার বেশি জমির মালিক অন্তত সরকারিভাবে এ রাজ্যে নেই। গ্রামাঞ্চলে সমীক্ষার কাজে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে দেখেছি, ৭০ বিঘা বা তার বেশি জমির মালিক একেবারে নেই তা নয়, তবে সন্তানদের মধ্যে সেই জমি বণ্টিত হলে তাদের আর বড়ো কৃষক বলে ধরা যাবে না। বিরাট জোত-জমির অস্তিত্ব না থাকলেও গ্রামে শ্রেণী-বৈষম্য প্রবলভাবেই আছে, জমির মালিকদের সাথে শ্রমজীবী মানুষদের সংঘাতও ভালো পরিমাণে বিরাজমান। কিন্তু সেই সংঘাত জমির পুনর্বণ্টনের দাবিতে বা অর্থনীতি-বহির্ভূত শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে ততটা নয়, বরং অনেক বেশি করে উঠে আসছে মজুরি-বৃদ্ধির দাবি, ফসলের লাভজনক দাম পাওয়ার দাবি, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার-তেল-বিদ্যুতের মূল্য-হ্রাসের দাবি। গ্রাম-বাংলায় তৃণমূল স্তরে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলোর অনুপ্রবেশ এবং হস্তক্ষেপ এই সব বিরোধকে একটা সীমার মধ্যে আটকে

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে জমি ও জমির মালিকানার বিন্যাস (শতাংশের হিসেবে)[১]

	প্রান্তিক কৃষক ১ হেক্টরের নিচে		ক্ষুদ্র কৃষক ১-২ হেক্টর		আধা-মাঝারি কৃষক ২-৪ হেক্টর		মাঝারি কৃষক ৪-১০ হেক্টর		বড়ো কৃষক ১০ হেক্টরের বেশি	
	মালিকের সংখ্যা	ব্যবহৃত জমি	মালিকের সংখ্যা	ব্যবহৃত জমি	মালিকের সংখ্যা	ব্যবহৃত জমি	মালিকের সংখ্যা	ব্যবহৃত জমি	মালিকের সংখ্যা	ব্যবহৃত জমি
পশ্চিমবঙ্গ										
২০০২-০৩	৮৮.৮	৫৮.৩	৮.৯	২৬.৭	২.১	১২.২	০.২	২.৭	০	০
১৯৭০-৭১	৬১.২	২৪.৮	২২.৮	২৮.৯	১২.৯	৩১.১	৩.০	১৪.৬	০.১	০.৬
সারাভারত										
২০০২-০৩	৬৯.৮	২২.৬	১৬.২	২০.৯	৯.০	২২.৫	৪.২	২২.২	০.৮	১১.৮
১৯৭০-৭১	৪৫.৮	৯.২	২২.৪	১৪.৮	১৭.৭	২২.৫	১১.১	৩০.৫	৩.১	২৩.০

রাখলেও, সুযোগ পেলেই যে গ্রাম-বাংলা ফুঁসে উঠছে, তার অজস্র নজির, বিশেষত সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-উত্তর পর্বে পাওয়া যাবে।

শহরে যেমন শ্রেণী বৈষম্য, ধনী-দরিদ্রের পাশাপাশি সহাবস্থান, ধনীর অট্টালিকার পাশেই ফুটপাথে শায়িত মানুষ আর ঝুপড়ির বাসিন্দাদের উপস্থিতি নজরে পড়ার মতো, গ্রামেও সেই বৈষম্য কম প্রকট নয়। সেখানে আর্থিক বৈষম্যের সাথে সামাজিক বৈষম্যর মিশেল নজরে পড়ার বিষয়। আগেই উল্লেখ করেছি, তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ গ্রামবাংলায় দুই-তৃতীয়াংশ, আবার তাদের মধ্যেই ভূমিহীনতা সবচেয়ে বেশি, জমির মালিকানা প্রান্তিক সীমার ওপরে কদাচ পাওয়া যাবে। স্বাভাবিকভাবেই একই গ্রামের বাসিন্দা হয়েও, সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত বৃহদাংশের মানুষ বর্ণ-হিন্দু-অধ্যুষিত তথাকথিত মূল-স্রোতের অন্তর্ভুক্ত নন। রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও এরা সমান অবহেলিত, বঞ্চিত। ডান-বাম প্রতিটি দলে, এতাবৎ গঠিত প্রতিটি সরকারে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতিপত্তি ও দাপট অব্যাহত।

অন্যদিকে, এই রাজ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বুঝি শেষ নেই। একেক জেলার মানুষের একেক ধরনের বৈশিষ্ট্য। আবার একই জেলার মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেলে শুধু মানুষ নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতা নজর এড়িয়ে যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমানের কৃষি-সমৃদ্ধ পূর্ব ভাগের সাথে উষর রুক্ষ পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক অমিল যেমন প্রকট, তেমনি অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও একেবারে ভিন্ন। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এক প্রান্ত কলকাতায় সাথে মিশেছে, সেখানে শিল্পাঞ্চলে সারা ভারতের মানুষ এসে জুটেছেন, আবার সেই দুই জেলাতেই রয়েছে বিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল, যেখানে বিপুল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে রাজ্যের দরিদ্রতম অংশের বসবাস, যাঁদের একাংশ আজও প্রাণ হাতে নিয়ে জীবিকা আর জ্বালানির খোঁজে প্রত্যহ জঙ্গলে ঢোকেন।

পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তে সুন্দরবন এলাকার মানুষ অন্যপ্রান্তে দার্জিলিং-এর পাহাড়ি অঞ্চলে গোর্খা জাতিসত্তার মানুষ— কোনো মিল পাওয়া যাবে এদের জীবন-যাপনের পদ্ধতিতে, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আচরণে, প্রাত্যহিক আচার-বিচার-সংস্কার আর সংস্কৃতির জগতে? বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে বিস্তৃত জঙ্গলমহল ও রুক্ষ পাথুরে লাল-মাটির দেশের সমস্যা রাজ্যের আর কোনও অঞ্চলের সাথে মিলবে কী? রুক্ষ লাল মাটির দেশের মধ্যে অবশ্য বীরভূম ও বর্ধমানের একাংশও পড়ে যায়। আবার উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-কুচবিহারের বেশিরভাগ অধিবাসী রাজবংশীদের সমস্যা, তাদের-ভাবনা-সংস্কৃতির জগতটা অনেকটাই অন্যরকম। এখানে সমস্ত এলাকার জন্য কোনো সাধারণ সমাধান-সূত্র খুঁজতে গেলে যে বিড়ম্বনার শেষ থাকে না, তা আমরা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের শেষ অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ করেছি।

২০০৬ সালে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের সকল এলাকার সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে শিল্পায়নকে তুলে ধরলো। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিতর্কের জবাব দিতে বলা হলো, কৃষি থেকে শিল্পে উত্তরণ একটা ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। এপথেই কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রম-শক্তির কর্ম-সংস্থান সম্ভব হবে। কৃষক-সমাজ কিন্তু এই যুক্তি মানলেন না, তারা জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁদের কাছে কৃষিকাজই জীবনজীবিকার প্রধান মাধ্যম, জমি সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। তাঁরা যুক্তি দিলেন, শিল্প হলে মূলত শহরের শিক্ষিত লোকজন চাকরি পাবে, কৃষক ঘরের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় শহরের ছেলে-মেয়েদের সাথে পারবে কেন? পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশেই গ্রাম আর শহরের মধ্যে শিক্ষা-লাভের সুযোগসুবিধায় যে বিস্তর বৈষম্য! তাই শিল্প-

স্থাপনের উদ্যোগে শহরের বেকাররা খানিক উৎসাহিত হলেও গ্রামের মানুষরা আতঙ্কিত হলেন জমি হারাবার ভয়ে। গ্রাম শহরের জীবন-ধারণের পথ ও পদ্ধতির এই গভীর তফাতটা না বোঝার ফলে, গ্রামীণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা না দেওয়ার ফলে কয়েক দশকের সুপ্রোথিত বামফ্রন্টের পায়ের মাটি সরে গেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ শুধু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে ভরপুরই নয়, সবার ওপরে রয়েছে গ্রাম আর শহর নামক দুটো পৃথক ক্ষেত্র, যে দুই এলাকার মানুষ দুটো আলাদা জগতে বাস করেন, প্রায়শ একে অপরের ভাষা বোঝেন না, একে অপরের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করেন না।

একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। মেদিনীপুর জেলে দেখেছি, বিকেলবেলা বন্দীরা যখন একটু খেলামেলা মেলামেশা ঘোরাফেরা করতে পারতো, তখন জেলখানার (যদিও রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় জেল এখন সংশোধনাগার, কিন্তু ভেতরের কিছুই যেহেতু বদলায়নি, তাই একে জেলখানা বলাই শ্রেয়) সেন্ট্রাল টাওয়ার থেকে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে গান বাজানো হত। কী গান? না মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 'বাঙালির প্রিয়' শিল্পীদের পুরোনো সব গান। আমরা কলকাতা থেকে যাওয়া কিছু বন্দী সেই গান শুনে মনোরঞ্জন করতাম। কিন্তু লক্ষ্য করতাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল থেকে আসা বেশিরভাগ বন্দীদের ওই গান আকর্ষণ করতো না। একদিন তো শালবনির এক কমরেড বলেই বসলেন, কী যে গান আপনারা শোনেন, আমাদের তো এই গান একেবারে ভালো লাগে না। জেলখানার পরিচালক জেলারবাবুরা তো শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, তাই তাদের পছন্দের গান চালাতেন, ওই অঞ্চলের মানুষের কী পছন্দ-অপছন্দ তাতে তাদের কী আসে যায়! ঐ কমরেডকে দেখতাম আরেকজন কৃষক কমরেডের সাথে বসে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় গান রচনা করতে, গান গাইতে।

সেদিন বুঝেছিলাম, আমাদের শহুরে মানুষের জগৎ আর প্রত্যন্ত গ্রামীণ মানুষের জগৎ কতো আলাদা! শহুরে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে আমাদের মনে হতেই পারে, প্রত্যন্ত এই গ্রামীণ মানুষেরা আদর্শগতভাবে পশ্চাদপদ। কিন্তু এই জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষই ২০০৭-০৮ সালে পুলিশি দমনের বিরুদ্ধে বিরাট গণজাগরণ ঘটিয়ে শহরের মানুষকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। স্মরণীয় হল, নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষ ২০০৭-এর ১৪ মার্চ কিন্তু রাধাকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনকে হাতিয়ার করেই পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন। আসলে কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালির রুচি-বোধকেই আমরা বাঙালির সংস্কৃতি বলে মনে করি। এই রাজ্যের জেলায় জেলায় বাঙালি সংস্কৃতির যে রকমফের আছে (অন্যান্য যেসব জনজাতির মানুষ এরাজ্যে বাস করেন তাদের পৃথক জীবন-চর্যার কথা যদি ছেড়েও দিই), তার খবর আমরা ক'জন রাখি?

আসলে এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই একেকটা অঞ্চল যেন একেকটা আলাদা দেশ, একেকটা বিশ্ব। একই রাজ্যের মধ্যে প্রতিটি জায়গা তার নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, এমনকি ভৌগলিকভাবেও একটা জায়গা অন্য জায়গা থেকে পৃথক। এই পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিটি এলাকার জনসমষ্টিকে পৃথক সত্তা দিয়েছে, তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি, বিচার-বোধ, মনন তৈরি করেছে। একটাই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হলেও, 'বাঙালি' বলে আমাদের একটা সাধারণ পরিচয় থাকলেও আমরা সবাই কিন্তু এক নই। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে ধনী-দরিদ্র, সম্পত্তিবান-সম্পত্তিহীন, তথা শ্রেণী-চরিত্রের নিরিখে গোটা রাজ্যের মানুষকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে দিলেই পরিচয় শেষ হয়ে যায় না। সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে, এবং প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতি-র মানুষকে পৃথক সত্তা দিয়েছে, সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে হয়। (রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞায় যারা উপজাতি সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত, তাঁদেরকেও জাতি হিসেবে গণ্য করা উচিত বলে মনে হয়, নাহলে তাঁদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় না, কোনো না কোনো বৃহৎ 'অগ্রসর' জাতির অধীনে থাকাটাই তাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, এমন ধারণা বদ্ধমূল থেকে যায়।) কলকাতা-কেন্দ্রিক নগর-সভ্যতা নগর-সংস্কৃতি বাঙালির মুখ্য পরিচিতি নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটা অঞ্চলের মতোই একটা অঞ্চল মাত্র। এর বাইরেই পড়ে আছে বৃহত্তর বাঙালি সমাজ, রয়েছে আরো বহু জনজাতির বাস, তাঁদের বহু-বর্ণময় যুগ-প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার কাহিনী। এই সমস্ত জন-গোষ্ঠীর সভ্যতা-সংস্কৃতির যোগফল হিসেবেই বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখতে হবে।

কিন্তু রাজ্যের সকল জন-সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতির খোঁজ-খবর নেওয়া কি সহজ কাজ? উত্তর দিনাজপুরের একটা গ্রামে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে একজন মহিলার কোনো কথাই আমি বুঝতে পারছিলাম না। উনি খাঁটি রাজবংশী ভাষায় কথা বলছিলেন। তখন একজন পুরুষ এসে তাঁর কথা আমাকে 'অনুবাদ করে' দিলেন। একই রাজ্যের অধিবাসী, কিন্তু আমাদের মুখের ভাষাতেও কতো তফাৎ! পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী-অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলে, গোর্খা-অধ্যুষিত দার্জিলিং-এর পাহাড়ি অঞ্চলে বা উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ রাজবংশী-অধ্যুষিত অঞ্চলের মাতৃভাষা কিন্তু বাংলা নয়, যদিও সেইসব অঞ্চলগুলো ভৌগোলিকভাবে এই বাংলার মধ্যেই অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের ডানপন্থী বামপন্থী কোনো শাসকই এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে পাত্তা দিতে চান না। বরং সকলকে এক বৃহত্তর বাঙালি জাতিসত্তার মধ্যে আত্মীকরণ করে নেওয়াতেই তাদের উৎসাহ বেশি (দিল্লীর শাসকরা যেমন হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান এই শ্লোগান

তুলে বিশাল এই দেশের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করতে চান)। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদের সামাজিক ভিত কলকাতা এবং শহরতলির বুদ্ধিজীবী বাঙালি-সমাজ, যাঁরা এই তফাৎগুলো নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে রাজি নন, ফলে এ রাজ্যের শাসকেরা সহজেই আঞ্চলিক স্বাধিকারের আন্দোলনগুলোকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ছাপ মেরে দিতে পারে, দমন-পীড়ন চালাতে পারে। গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরি, গ্রেটার কুচবিহার বা ঝাড়খন্ড রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনকে সহমর্মিতার সাথে দেখতে, তাঁদের স্বশাসনের অধিকারকে মর্যাদা দিতে শিক্ষিত বাঙালির অনীহা এক প্রকার বাঙালি জাতি-দম্ভের পরিচয় বলেই মনে হয়, যা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নানা-ভাষা নানা-মত নানা-পরিধানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায়।

পশ্চিমবঙ্গের পরিচয়ের মধ্যে তাই বহু দিক রয়েছে, রয়েছে বহু মাত্রা। পাহাড় থেকে বঙ্গোপসাগর... এই কয়েক শো কিলোমিটার পরিসরে যেমন রয়েছেন বহু শ্রেণীর মানুষ, তেমনি আছেন বহু ধর্ম বর্ণ জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও আছে নানান স্তর ও বৈশিষ্ট্য। তবে এতসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও একটা মিলের জায়গা আছে। তা হলো, নিম্নবর্গের প্রতিটি জনগোষ্ঠীই একটা পরিমাণে রাষ্ট্র থেকে, রাষ্ট্রের উন্নয়ন-কর্মসূচি থেকে নিজেদের বিযুক্ত মনে করেন। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে তাঁদের বঞ্চনার যেন শেষ নেই। শাসনক্ষমতায় শাসকের বদল হলেও, ক্ষমতার রং ও ঢং বদলালেও তাদের বঞ্চনার ইতিহাস শেষ হয় না। তারা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো ভাবে ক্ষমতাসীন শাসকদের দমন-পীড়নের শিকার হন, সাধ্যমত প্রতিরোধেও সামিল হন। বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম ও জাতিভুক্ত নিম্নবর্গের মানুষ যাতে নানান বঞ্চনার শিকার হয়েও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নেন, রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা অনুযায়ী দিনযাপন করেন, পাঁচ বছর অন্তর ভোট-দানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার চরিতার্থ করেন— তা সুনিশ্চিত করতে সংসদীয় দলগুলো সদা-তৎপর থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতিতে সংসদীয় রাজনীতি একেবারে নিচুতলা অবধি জাল বিস্তার করেছে। একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্রতম জনবসতি থেকে শুরু করে উচ্চবর্গের পীঠস্থান শহরের নামিদামি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও এরাজ্যে দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেই অর্থে পশ্চিমবঙ্গ একটি আপাদমস্তক 'রাজনৈতিক' রাজ্য। রাজনীতির রং দিয়ে এখানে মানুষের বিচার হয়, রাজনীতির নৈকট্য অনুযায়ী বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, রাজনীতিতে মতান্তর হলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাথেও মুখ দেখাদেখি বন্ধ হতে পারে। রাজনৈতিক হানাহানিতে এখানে জড়িয়ে পড়েন একই নিপীড়িত শ্রেণী ও অবহেলিত ধর্ম-বর্ণ-জাতির মানুষ। নিপীড়িত জন-সমাজের মধ্যে চিরাচরিত আড়াআড়ি ঐক্য-সংহতিকে দলীয় রাজনীতি এখানে খাড়াখাড়িভাবে টুকরো করে ফেলে। সুদীর্ঘ বামফ্রন্ট রাজত্বের সুবাদে আমাদের এই রাজ্য এই বৈশিষ্ট্যটি অর্জন করেছে।

এরকম আরো অনেক বৈশিষ্ট্য নিয়েই আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। এক কথায় এর পরিচয় দেওয়া যায় না। লেনিন বলেছিলেন, কোনো সমাজকে জানতে গেলে যেতে হবে কৃষকের পর্ণকুটিরে, শ্রমিকের বস্তিতে। এরাজ্যের পরিচয় পেতে হলে আমাদের আলোচনা অবশ্যই নিবদ্ধ করতে হবে শ্রমজীবী জন-সমুদায়ের ওপরে, বিভিন্ন জনজাতির বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপরে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই এই গ্রন্থনার কাজও কখনো শেষ হবার নয়, রাজ্যের পরিচয় সবসময়েই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মানুষের ইতিহাসকে বিবৃত করতে গিয়ে যেমন এক ইতিহাস-গবেষক লিখেছেন— 'যে গল্পের শেষ নেই', তেমনি আমাদের এই রাজ্যের গল্পও কোনদিন শেষ হবার নয়। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী আর অভিজ্ঞতা-প্রসূত ধারণাগুলো খানিকটা সাজিয়ে পশ্চিমবঙ্গের একটা পরিচয় পাবার চেষ্টা করতে পারি মাত্র। (ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো লেখার ইচ্ছা থাকলো।) পরিবর্তনশীল এই দুনিয়ায় কোনো কিছুরই পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বলে কিছু হয় না, তাই অংশগুলোকে জুড়ে জুড়ে পূর্ণ একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করে চলে মানুষ। আমাদের এই প্রচেষ্টা তারই অঙ্গ হিসেবে ধরতে হবে।

১। Some aspects of Operational Landholding in India, 2002-03, NSS, 59th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, August 2006.

২। Surya Kanta Misra, 'On Agrarian Transition in West Bengal', The Marxist, April-June 2007, p. 14.

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর ৯৮৩০৯২২১৮৪ বা ৯৩৩১০১২৫৩৭